লক্ষ্যহারা

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক—শ্রীসিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়
গোলাপ পাব্লিশিং হাউস্
১২, হরীতকী বাগান লেন
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—১০০০,
১৩৩৯
দেড় টাকা

মুদ্রাকর—
শ্রীসিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়
গোলাপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১২, হরীতকী বাগান লেন
কলিকাতা

শ্রীপ্রণব রায়
শ্রীফণীন্দ্র পাল
শ্রীসুনীলকুমার ধর
শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

বন্ধুচতুষ্টয়কে—

—ক্ষেত্রমোহন

মহালয়া, ১৩৩৯
"নবীনকুটীর"
গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।

"এ মাটির ঢেলা কবে কে ছুঁড়িয়া সূর্য্যের পানে ভাই—
পৃথিবী যাহার নাম ;
লক্ষ্যভ্রষ্ট চিরদিন সে যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফেরে
সূর্য্যেরে অবিরাম।"

লক্ষ্যহারা

মাত্র তিনটি প্রাণীব পক্ষে ছু'খানি ঘরের কোন দরকারই ছিল না। উপরে এবং নীচে চারটি ঘর ত' বরাবর খালিই পড়ে থাকে। তবু এ সংসারের কর্ণধার যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন সেগুলি ভাড়া খাটিয়ে পয়সা তোল্‌বার কথা কা'রো মনেই হয়নি। কিন্তু তারপর ঘর ক'খানির একটা ব্যবস্থা না করে আর চলে না। সংসারের প্রাত্যহিক খরচের উপর নিজের কলেজের জন্যেও মোটা টাকার দরকার। পৈতৃক যে কিছুই ছিল না—তা নয়, কিন্তু সেবার বিয়েও দিতে হবে সেই থেকে। কাজেই, আমাদের ছু'তলা বাড়ীর সামনের বারান্দায় একদিন ঘর-ভাড়ার বিজ্ঞাপন ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল।

মা বল্‌লেন,—ছোট ছেলে-মেয়ে নিয়ে যদি একঘর বামুন ভাড়াটে আসে,—তবেই খুসী হই। নইলে সেবা আমাদের একা একা 'খুন' হয়ে যায়।

মাকে বল্‌তে হ'ল, এ-মতে সায় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না; কারণ, ছোট ছেলেমেয়ে এলে সেবার কিছু সুবিধে হয় বটে, কিন্তু আমার তা'তে খুন হ'বার সম্ভাবনাই বেশী।

সেবা কিন্তু আমার মতে রাজী নয়। বল্‌লে, তার সম-বয়সী ছুটি ছেলে-মেয়ে নইলে ও ভারি রাগ করবে।

ওর বয়স তখন সাত।

ছুটির দিন, বাড়ীতেই ছিলাম। নীচে কড়া নড়ে' উঠ্‌লো। বল্‌শেভিজমের ইতিহাসের পাতায় মন তখন ক্ষেপা ঘোড়ার মত ছুটে চলেচে, তবু থামতে হয়।

ছাতা বগলে, চোখে চশমা—শীর্ণ লোকটি নমস্কার করে বল্‌লেন, ঘর খালির কথা দেখ্‌তে পেলুম। কত ভাড়া?

লোকটি বোধ হয় অনেক দূর থেকে হেঁটেই এসেচেন,—কপালে ঘাম। অকারণেই সহানুভূতি বোধ করি। বললাম, আগে ঘর দেখা হ'লে ভাড়ার কথা হবে। আপনারা ক'জন?

—উপস্থিত দু'জন—আমি আর আমার বিধবা বড় ভগ্নী। এর জন্যে চারখানা ঘর দরকারই হয় না, কিন্তু মেয়ের সম্প্রতি বিয়ে দিয়েছি, জামাই-মেয়ে যদি আসা যাওয়া করে……

খুসীই হ'লাম। আপাততঃ দুটি প্রাণী,—ছোট ছেলেমেয়ের হাঙ্গামা নেই, চমৎকার!

—আপনারা?

—ব্রাহ্মণ।

—আমরাও তাই।

ঘর অবশ্য না পছন্দ হবার কারণ ছিল না, ভাড়াও ঠিক হ'য়ে গেল। যাবার সময় ভদ্রলোক বল্‌লেন,—

ভাড়া একটু বেশী,—তা' হ'ক। দিদির আবার বামুন পরিবার নইলে চলে না, দিবারাত্রি কলতলাতেই থাকেন। আচ্ছা,—

মা অবশ্য মর্ম্মাহত হ'লেন,—সেবাও। তবে ব্রাহ্মণ শুনে জোর গলায় আপত্তি করেন নি। নীচে তলায় একবার 'কলি' ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

ভদ্রলোক—রামতারণ ভটচায রেলের চাকুরে, অগ্রিম টাকাও দিয়ে গেলেন। তারপর এক রবিবারের সকালে গরুর গাড়ী বোঝাই জিনিষ-পত্তর এসে পৌছল, ভট্‌চায এবং তার ভগ্নীও। তবে এই আসার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না; নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন এবং নিরাড়ম্বর।

রামতারণের দিদি বাড়ী ঢুকেই ঘরগুলিতে গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিলেন, তারপর এলো জিনিষ-পত্তর। মার সঙ্গে তাঁর আলাপ জম্‌তে বেশী দেরী হ'ল না। ঘরে বসেই সব শোনা যায়।—

—আহা, বল কেন ভাই,—আমিই কি আর বলিনি! বলি, ও' বয়সে কত লোকই ত' বিয়ে করচে, তা শোনে কে!...... হ্যাঁ, মেয়েটির বিয়েও বেশ ভাল ঘরে হ'ল—এই তোমাদের আশীর্ব্বাদে। লেকাপড়া তেমন বেশী নয়, ছেলে-মানুষ।

তা' আমাদেরও উষার বয়স বেশী কি, এই বারো।......রাহু কি আর এত শিগ্‌গির কাছ-ছাড়া করতে চায়? বলে, যাক্ আরো দু'-পাঁচ বচ্ছর। শুনে লজ্জায় মরি; বলি, রাধু বাম্‌নী যতদিন বেঁচে আছে, ততদিন ও-সব খেরেষ্টানি চল্‌বে না বাম, পাত্তর দেখ। তবেই না,—

এমনি অবিশ্রান্ত আলাপ। এর চেয়ে দু'টি ছোট ছেলে মেয়েও এলে বোধ হয় শান্তিতে থাকা যায়। এত অল্প সময়ের ভিতর দু'জনের এত পাকাপাকি রকমের পরিচয় হয়ে গেল যে, আশ্চর্য্য না হয়ে পারি না। দু'জন পুরুষের মধ্যে এত অনায়াসে ঘনিষ্ঠতা সম্ভব নয়।

মার মুখে শুনি, রাধু আজ্ পাঁচ বচ্ছর ভায়ের সংসারে আট্‌কে আছেন,—উঁার মায়েব মৃত্যুর পব থেকেই আর কি! ছেলে-পুলে কোন দিনই ছিল না,—নিরুপদ্রব।

উষাব কথাও রাধুর মুখে প্রায়ই শোনা যায়।—আহা, শ্বশুর-বাড়ী যাবার দিন মেয়েটার কি কান্না! বলে, পিসী, তুমিও চলো, নইলে যাবো না। মনে মনে হাসলুম দিদি! বলি,—আমায় আর যেতে হবে না লো, অমন কান্না আমরাও একদিন কেঁদেছি; তারপর দু'দিনেই সব,—

মা বোধ করি এ' বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করেন নি। আমি কিন্তু অদেখা উষার জন্যে ঘরের মধ্যে সেদিন হঠাৎ ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিলাম। তাকে দেখিনি,—দেখা হ'বে কিনা তাই বা কে জানে। তবে বাপ ও পিসীকে গৌরীদানের

পুণ্য দিয়ে. বিনিময়ে মেয়েটি যা পেয়েছে, তা হয়ত খুব সুখের নয়। আজ হয়ত পথে পথে ছুটোছুটি করে বেড়ানই তার উচিত ছিল,—এখনও তার দু' চোখে হয়ত শিশু-স্বপ্নের ঘোর ! স্বামীর পাশে শুয়েও হয়ত রূপকথার রাজপুত্রের কথা ভাবে, রাক্ষস-রাক্ষসীর কথা মনে করে ঘুমের মধ্যে শিউরে উঠে !

কিন্তু, কে জানে এ'সব সত্যি অথবা আমার অলসতার অসম্ভব যত কল্পনা !

এদিকে—

রামতারণ ন'টার সময় যা হয় দু'টি মুখে দিয়ে ছোটেন চাকরি বজায় করতে, সন্ধ্যা নামবার আগে ফেরা হয় না।

রাত্রি জেগে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হই, নিশীথের গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে কত রাজ্য, শাসন ও শোষণ-নীতির সঙ্গে পরিচয় হয়।—অর্থ-নীতির নানা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাই ; দেশের দারিদ্র্য আকাশের তারার মত চোখের উপর ফুটে ওঠে। পৃথিবীর······কত বিচিত্র জীবনের সঙ্গে হয় পরিচয় !

ডাক পড়ে রামতারণের ঘরে।

সন্ধ্যা তখন উৎরে গেছে। বল্‌লেন, এই যে এসেছ ! ভারি বিপদে পড়েই ডাক্‌তে হ'ল। আমাদের ঊষা—আমার মেয়ে, তাকে তুমি দেখনি,—কোত্থেকেই বা দেখ্‌বে ! রসুলপুরে ওর গত বছর বিয়ে দিলাম। তারপর মোটে একটিবার সে

আমাদের কাছে এসেচে, বেয়াই-মশাই কিছুতেই পাঠাতে চান না; জামাইটির বয়স অল্প—মতামত ব'লে কিছু নেই! এদিকে মেয়ে আমার এখানে আসবার জন্যে ভারি উৎসুক;—হ'বারই কথা। তোমরা লেখাপড়া জানা ছেলে, এ বিষয়ে কি রকমটি করলে সব দিক দিয়ে ভাল হয় বল দেখি বাবা!

এত বড় একটা গুরুতর বিষয়ে মতামত দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাইনি। সব দিক রক্ষা করবার উপায়ও হঠাৎ চোখে পড়ে না! যে ছোট মেয়েটি সুদূর রসুলপুরের গৃহ-সীমানার মধ্যে বসে বাপ ও পিসিমার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, তার সেই নিঃশব্দ এবং অনুচ্চারিত বেদনার কথাই বড় বেশী করে মনে হতে লাগল।

রামতারণ এক টুক্‌রো কাগজ বের করে দেখালেন! তা'তে পূজনীয় বৈবাহিক মশায়কে উষার ছুটি মঞ্জুরের জন্য বিস্তর কাকুতি করা হয়েছে। কিন্তু না করেই বা উপায় কি! 'বেশ হয়েচে' বলে এলাম।

তারপর মধ্যে মধ্যে রামবাবুর ঘরে যেতেই হয়। রেল-কোম্পাণীর অডিট্-বিভাগে এত বড় একটা আলাপী মানুষ থাক্‌তে পারে, এ কথা কে ভেবেছিলো? আশ্চর্য্য হলাম।

ফাঁসীর আসামী উল্লাসকরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এ দেশের মাটী একদিন স্বাধীন হবে,—এ স্বপ্নও একদিন তাঁর মনকে নাড়া দিয়ে গেছে,—সাড়াও একটু দিয়েছিলেন! কিন্তু তারপর কোথায় কি! একবার কাগজে নারী-স্বাধীনতার

স্বপক্ষে চমৎকার একটা প্রবন্ধও নাকি তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছিল!—সে প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা। আজ তাঁরই মেয়ে বারো বছর বয়সে স্বামীর ঘর করতে গেছে—এ'জন্য দুঃখও কর্‌লেন।

রামবাবু শুধু আলাপী ন'ন, গুণীও। খাওয়া-দাওয়া সেরে ছোট বীণখানি নিয়ে বসেন আলাপ করতে,—খাসা মিষ্টি হাত। রাত্রির নিস্তব্ধতা তাঁর সুরের ঝঙ্কারে যেন কাঁদতে থাকে! যেন, বেদনার ঝর্ণা।

রসুলপুর থেকে সত্যিই একদিন চিঠি এল। উষাকে এঁরা নিয়ে আসতে পারেন, কিন্তু মোটে চারদিনের জন্য,—তা'ও আসা-যাওয়া নিয়ে। তবু ভাল! উষার পিসিমা উদ্যোগ করতে লাগ্‌লেন, রামতারণ লাগ্‌লেন ছুটী খুঁজতে! ওই ছোট মেয়েটি যে এই ছোট পরিবারটির পক্ষে কত বড় তা' বেশ বোঝা যায়। সেবা পর্য্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠেচে,—একটী সঙ্গী পাবার আশায়। মা'ও তাকে দেখবার জন্যে ব্যস্ত!—বারো বছরের একটি মেয়ে!

দিন কয়েক পরে এল উষা, সঙ্গে একটী বছর ষোলর ছেলে। ওর শ্বশুরের দূরাত্মীয়ের ছেলে, প্রতিবেশীও বটে। শ্বশুর বা তাঁর ছেলে কেউই আসবার মত সময় করে উঠ্‌তে পারেন নি।

ঊষার পদপাতের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীটার চেহারা যেন বদ্‌লে যায়। বাড়ীটা যেন ঘুমিয়েছিল, কোন্ যাদুকরী হঠাৎ তাকে চঞ্চল করে তুলেচে। উপরে নীচে একশবার ছুটোছুটি, অকারণ হাসি, অর্থহীন কলরব। 'বাবা, আজ চিড়িয়াখানা দেখ্‌তে যাব, আসবার সময় যাদুঘর।' 'উঃ, ওখানে আমার কি কাজ ছিল জানো পিসিমা? খালি ঘোমটা মাথায় দিয়ে শাশুড়ীর পাশে—রান্নাঘরে বসে থাকা।...'

এখানে ও এসে যে উল্লাস ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে, তার পরমায়ু যে মোট চারদিন সে কথা যেন ভুলেই গেল। ওর অন্তরে হয়ত এই ক'টি দিবস রাত্রি হাজার বছর আয়ু নিয়ে বেঁচে থাক্‌বে।

সেবার সঙ্গে ওর ভারি ভাব হয়ে গেল। সেবা বলে, ওকি ভাই, মাথায় ঘোমটা দিলে না যে?

ঊষা বলে, তুই কিছু জানিস না ভাই, এখানে ঘোমটা দেব কেন—? তুই ভারি বোকা! শুনলাম সেবা ওকে জিজ্ঞাসা কচ্ছে, বরকে তুমি কি বলে ডাকো ঊষাদি?

—জানি না যা'। তুই ভারি দুষ্টু। সে তো আমাদের কাছে থাকে না; থাকে জেলার সহরে। লেখাপড়া করে।

একদিন বাতাসের ঢেউয়ের মত আমার পড়ার ঘরের মধ্যেই ঢুকে পড়ে।

—তুমি সেবার দাদা, নয়? তুমি বুঝি খালি পড়া কর? ওটা কি বই—ছবির? আমায় দাওনা।

বইখানি দেবার মত নয়, উষাকে ক্ষুণ্ণ করতে হ'ল। বল্‌লে, ঈশ্‌! আমার বুঝি ছবির বই নেই! কত—কত! 'সাবিত্রীর ব্রত কথা', 'গৃহলক্ষ্মী'···আরও কত কি!

তারপর যেমন বিনা ভূমিকায় এসেছিল, ঠিক সেই ভাবেই বেরিয়ে গেল। এই দুরন্ত উষা সেখানে কি করে কাটায়...সে এক বিস্ময় বটে।

খানিক পরে মা এলেন ঘরে। উষা আমার ঘরে এসেছিল, সেজন্য তার পূজনীয়া পিসীমা তা'কে বিস্তর অনুশাসন দিয়েচেন! তার মত 'বুড়োধাড়ী' মেয়ের পক্ষে এ' রকম 'বেহায়া'-পনা যে কোন কারণেই শোভনীয় নয়, সেই কথাই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েচেন। উষা ঘরে ঢুকলে আমি যেন তা'কে আমল না দিই—সেই জন্যেই তিনি মা'র মুখে খবর পাঠিয়েচেন।

রাগের চেয়ে লজ্জাই করি বেশী। পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের কথা কি জানে ও, কেন তা'র কচি মনকে এখন থেকে কুটীল করে তোলা? মাকে বল্‌লাম, এ' রকম ছোট মনের লোক নিয়ে বেশীদিন চল্‌বে না মা, তুমি ব্যবস্থা করো।

মা বল্‌লেন, কিন্তু, ওরা যে···

—জানি। কিন্তু উষা তার মানে বোঝে? ওকি জানে যে ওর অবস্থার মেয়ের পক্ষে আমার কাছে আসা অন্যায়? ওর পিসীকে বলো, আমারও বোন আছে, তার বয়স ওর চেয়ে খুব বেশী ছোট নয়।

পরদিন সকালে রামবাবুর সঙ্গে দেখা। দিদির গত রাত্রির ব্যবহারে ভারি লজ্জা পেয়েচেন, বল্‌লেন।

ঊষা এসে পর্য্যন্ত চিড়িয়াখানা দেখবার জন্য লালায়িত হয়ে আছে, নিয়ে যেতে হ'বে। ছুটিও নিয়েচেন। সেবা ওঁদের সঙ্গে যাবে।

আপত্তির কিছু ছিল না।

ঊষার পিতৃগৃহ-বাসের আয়ু নিঃশেষ হয়ে গেল। এ যেন সে ঊষা নয়। মুখে অনির্দ্দেশ্য বিষাদের ছায়া, সে মুখরতা নেই—হাসিটুকুও না; পিসিমা গোছগাছ করতে ব্যস্ত। যে ছেলেটি ওর সঙ্গে এসেছিল, তার উপর নির্ভর করে রামতারণ মেয়ে পাঠাতে পারেন না, নিজেও যাবেন।

গাড়ী তৈরি। মা থেকে সেবা—সবাই দুয়োরের কাছে। ঊষা গাড়ীর মধ্যে উঠ্‌তেই—সেবা চীৎকার সুরু করে দেয়;—সঙ্গে যাবে। ঊষাও উৎসাহিত হ'ল।

কিন্তু মা বল্‌লেন, কোথায় যাবে! যে ম্যালেরিয়ার দেশ।

এক বৎসর পরে।—

পরিবর্ত্তন বিশেষ কিছুই হয়নি, কেবল রামবাবু চাকরি ছেড়ে পেন্‌সানের সুখ উপভোগ করচেন। তা ছাড়া সেই এক-ঘেয়ে বৈচিত্র্যহীনতা। অবশ্য এর মধ্যে উষা আরও দু'বার এসেচে। প্রথমবার পাঁচদিনের জন্যে, দ্বিতীয়বার শুধু এক রাত্রি,—কি একটা যোগে শ্বশুরের সঙ্গে কালীঘাটের আদিগঙ্গায় পুণ্যস্নান করতে। রামবাবুর মুখে শুনেচি, উষার স্বামী জেলা-ইস্কুলের মোহ কাটিয়ে কিছুদিন পূর্ব্বে বাড়ীতে ফিরে এসেচে। বোধ করি, পল্লীর আমবাগান এবং ঘরে সমবয়সীদের নিয়ে অত্যাচার উপদ্রব করে বেড়ায়।

ঊষার পিসীমা নিয়মিতভাবে প্রত্যেকদিন গীতা পাঠ ও পূর্ব্বে যে বাড়ীতে ছিলেন তার মালিকের পরিবার-বর্গের নিন্দা করেন। মানুষ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, যা' চোখে দেখেচেন তা'র বাইরে কিছু কল্পনা কর্‌বার শক্তি তাঁর নেই। কিন্তু সে কথা তাঁকে স্বীকার করাবে কে!

সেবা ইস্কুলে পড়চে। রাধু এটা পছন্দ করেন না। মাকে ওর বিয়ে দেবার কথাও বলেছিলেন, কিন্তু মা সে সম্বন্ধে খুব ব্যস্ত ন'ন। নিজের কথাও একটু বলা দরকার। পোষ্টগ্রাজুয়েট ক্লাসে ঢুকে নতুন একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হ'ল। অশান্ত জন্মে অবধি বোধ হয় মাথায় তেল দেয়নি, অন্ততঃ দেখলে তাই মনে হয়। চুলগুলি অনাবশ্যক লম্বা; অত্যন্ত আস্তে আস্তে চলে, কিন্তু কথা বলে তা'র উল্টো। শুনেচি কবিতা লিখে ইতিমধ্যেই বাংলা সাহিত্যে সে নাম করে ফেলেছে। থাকে মেছোবাজারের কাছে অন্ধকার একটা মেসে। সংসারে কেউ নেই বল্‌লেই হয়।

ওর বর্ণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য নেই—সেদিক দিয়ে নিতান্তই বাঙালী, কিন্তু তার মধ্যেই আছে অদ্ভুত একটা কিছু। অবশ্য ওকে দেখ্‌লে ভালবাসার ইচ্ছে কোন মেয়েরই হয় না, কিন্তু অবহেলা করে কা'র সাধ্য।

একদিন বল্‌লে, অর্থনীতির পুঁথি ত অনেক ঘাঁটলে, কটা লোকের অভাব তাতে ঘুচলো অজয়? যাতে সত্যকার কিছু হয়, তাই কর।

—তোমার মত কবিতা লিখবো ? জিজ্ঞাসা করি।

—পাগল ! কাব্য-লক্ষ্মী এদেশের জন্যে নয়। নইলে বিদেশের পুরস্কারের আলো দিয়ে আমাদের রবীন্দ্রনাথকে চিন্‌তে হ'ত না,...

—তবে কি করবো বলো ?

—করবার কাজ বহুত, কেবল লোক নেই। আচ্ছা, একদিন তুই আমার মেসে যাস, অনেক কথা বলবার আছে। হ্যাঁ, পাঁচটা টাকা দিতে পারিস ? কিচ্ছু নেই ! কিন্তু, ফেরৎ দিতে পারবো না।

আর কেউ যদি এমনি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের দাবীতে টাকা চাইত, তাহ'লে তাকে অশ্রদ্ধা করতাম নিশ্চয়ই। কিন্তু অশান্তর বেলায় সে নিয়ম অচল। মানুষকে মুঠির মধ্যে নিয়ে যাবার কৌশল ও ভাল করেই জানে।

সঙ্গে টাকা ছিল না ; বললাম, ঠিকানা দাও, সন্ধ্যের সময় টাকা নিয়ে তোমার ওখানে যা'ব।

অনেক কষ্টে মেসটার সন্ধান পাওয়া গেল। অশান্তর ঘর অন্ধকার—আলো জ্বালেনি। পায়ের শব্দ শুনেই ভিতর থেকেই ডাক দিলে,—আয়।

—আলো জ্বালোনি ?

—না, বড্ড স্পষ্ট।

টাকা কটা বার করলাম, কিন্তু নিলে না।

—পাগল !—পাছে না আসিস্, সেই জন্যেই ওটা করেছিলাম।

ওর সবই অদ্ভুত! টাকা চাইলে বন্ধুবিচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক, কিন্তু অশান্ত চায় ওইটে দিয়েই বন্ধুত্ব দৃঢ় করতে!

বল্লে, এটা 'ডেমোক্রেসীর' যুগ, জানিস ত? মানুষ আজ কারো পায়ের নীচে পশুর মত বেঁচে থাকতে চায় না। আমিও। এই অন্ধকার বুক-চাপা ঘর, সকাল ছ'টা থেকে রাত্তির তিনটে পর্য্যন্ত খেটে খরচ চালাই,......তবু, এই ঘরে বসেই দেখি স্বাধীনতার স্বপ্ন; এটা খুব সত্যি অজয়, যা'রা মানুষের মুক্তির জন্যে খাটতে চায় তা'দের পৈতৃক পরিচয়ের কোন দরকারই হয় না, বিধাতার আশীর্ব্বাদ তা'দের কপালে আগুন হয়ে জ্বলে। তুই, আমাদের দলে আয়।

—তোমাদের দল! কিসের—?

—বিশেষ কিছুর না। এ' দেশের নির্ব্বোধ চাষী মজুর-গুলোর মাথায় বুদ্ধির দীপ জ্বেলে দেবার জন্যে একটু খাটতে হ'বে। ওরা যতদিন না নিজেদের চিনতে পারচে, ততদিন কোন আশাই নেই। ওরাই আছে সমস্ত দেশ জুড়ে ..নইলে, রকফেলার আর দেশে কটা?—আস্‌বি?

চট্ করে উত্তর দিতে পারি না। বইয়ের পাতায় দেশের দুর্দ্দশার পরিচয় পেয়ে অনেক দুঃখ করেচি, কিন্তু তার প্রতিকারের জন্যে কাজে নামবার কল্পনা কোনদিন মাথায় ঢোকেনি। মা ও সেবার কথা মনে পড়ল; তবু সোজা না বলতে পারলাম কই?

—ভেবে দেখব। তবে এর মধ্যে রক্তারক্তির কোন সম্ভাবনা নেই ত?

কথাটা বলেই বুঝতে পারি, অশান্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছে। উঠে বসল, বললে, তোর সম্বন্ধে একটা ভাল 'আইডিয়া' ছিল...যাকৃগে। একটা কথা কেবল মনে রাখিস, যারা দেশের জন্যে কাজ করতে চায়, তারাও মানুষ। মানুষের প্রতি মমতা তা'দেরও কম নয়। তা'রাও জানে হিংসার মত পাপ নেই। আচ্ছা...এখন আয়, কেউ থাকলে আবার লিখতে পারি না।

মাকে বললাম। মা ত' ভয়েই অস্থির, কেঁদে ফেললেন। রাধু এসে এ' বিষয়ে তাঁকে পূর্ণ সমর্থন ত' করলেনই, উপরন্তু যদি আমি সে রকম কিছু করি' তবে এ' বাড়ীর সঙ্গে তাঁদের আর কোন সংশ্রবও যে থাকবে না, তাও বলে রাখলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় রামতারণ ঐ বিষয়ে কোন কথাই বলেন নি। তবু, অশান্তর অনুরোধ রাখা সম্ভব হয়নি।

তারপর সেই নিত্যকার একঘেয়ে জীবনস্রোত। কিন্তু অশান্তই আমার জীবনে অশান্তির আগুন ধরিয়ে দিলে যেন। আর যেন আমার এই বহু দিবসের পরিচিত বাড়ীটাকে মধ্যে

মধ্যে যথেষ্ট মনে হয় না; এক উদার, উদ্দাম জীবনের স্বপ্ন কতবার আমার রাত্রির প্রহরগুলি বিনিদ্র করে তোলে! শিবাজীর স্বপ্ন—অশান্তের স্বপ্ন।

অশান্ত কিন্তু কিছুতেই আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হয় না! কত দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিচিত্র ইতিহাস ও-র মুখে শুনতে পাই। মিশর, আফগানিস্থান, তুরস্ক, ইটালী...বলে আর মুখের দিকে চেয়ে অদ্ভুত ক'রে হাসে।—এই ত' জীবন!—with pulse and passion.

রসুলপুর থেকে হঠাৎ টেলিগ্রাম।

উষার স্বামীর অসুখ। এখান থেকে কা'রো যাওয়া প্রয়োজন।

রামবাবু নিজেই গেলেন। পিসিমা যতগুলি দেবদেবীর নাম জানতেন, বোধ করি তাদের প্রত্যেকের নামে পূজো বা পয়সা মানত করলেন। ভেবেছিলাম, বিশেষ কিছুই নয়, কিন্তু দিন কয়েক পরে ভুল ভাঙল। রামবাবু ফিরলেন, সঙ্গে উষা; কিন্তু সে উষা নয়—যাকে ইতিপূর্ব্বে দেখেচি। হাত দুটি নিরাভরণ, চুলগুলি রুক্ষ, সিন্দুর-হীন; পরণে চুলপাড় কাপড়। রামবাবুর দিকেও হঠাৎ চাইলে চম্‌কে উঠতে হয়, কয়দিনেই যেন দশ

বছর বয়স বেড়ে গেছে। পুরুষ মানুষ, চোখে জল হয়ত সহজে আসে না, তাই পাথরের মত নির্ব্বাক হ'য়ে রইলেন। পিসিমা পোড়াকপালী মেয়ের অবস্থা দেখে শিলের উপর মাথা ঠুকতে যাচ্ছিলেন, মা অতিকষ্টে নিবারণ করায় ব্যাপার বেশী দূর গড়ায়নি। রাধুর কাণ্ড দেখে বেচারী সেবা পর্য্যন্ত কাঁদতে সুরু ক'রে দেয়। কিন্তু যাকে নিয়ে এই বিরাট শোকের সূচনা, তার চোখে মোটেই জল নেই,—কালবৈশাখীর শুক্‌নো আকাশের মতো—ভয়ঙ্কর। সেদিনের সেই ক্রন্দন-কলরোলের মধ্যে যে তার নারী-জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষার মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ করা হয়ে গেল, সে কথা সে বোঝেনি! কিছু একটা শোচনীয় ব্যাপার হয়েচে তা'ই সে জানে, অন্ততঃ একটি মানুষ যে আর নেই, এটুকু সে বুঝেচে।

উষার জীবন-যাত্রার প্রথম পরিচ্ছেদের উপর যবনিকা পড়ে গেল এই খানেই। রসুলপুর তার মনের কোন অন্ধকার কোণে স্মৃতি হয়ে রইল কিনা কে জানে, তবে রামবাবু মেয়েকে আর কাছ ছাড়া করবেন না, ঠিক হ'ল।

হঠাৎ অশান্তর কাছ থেকে ডাক আসে। ঘর চিরদিনের নিয়মানুযায়ী অন্ধকার, যদিও আলো জাল্‌বার সময় হয়েচে।

চৌকীর একপাশে—অন্ধকারের মধ্যেই জায়গা করে নিই।

অশান্ত বল্‌লে, বড় বিপদে পড়েই ডাকতে হ'ল ভাই। ভয় পাস্‌নে, টাকা চাই না।

একটু চুপ করে থেকে আধপোড়া মোমবাতিটা জ্বাল্‌লে। ভাঙ্গা টেবিলটার ওপর একখানা রঙীন খাম—উপরে অশান্তর ঠিকানা,—পড়তে বল্‌লে। সাকী ব'লে কে একটী মেয়ে অশান্তকে চিঠি লিখেছে। চিঠির ভাষার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটু বেদনার সুর ছিল,—পড়লেই মনের কোথায় যেন আঘাত ক'রে যায়। সাকীর সম্বন্ধে কিছুই জানি না, তবু একটা অগোচর অনুকম্পায় হৃদয় দুলে ওঠে।

সাকীর কথা জান্‌তে চাই।

অশান্ত বলে,—প্রায় বছর দুই আগেকার কথা, দলের একটা কাজ নিয়ে চট্টগ্রাম যেতে হয়েছিল।

কাজটা খুব নিরাপদ নয়, পুলিশও ছুটেছিল পিছু পিছু—জান্‌তে পারিনি। যখন খপর পেলাম তখন রাতও অনেক, সঙ্গে বৃষ্টিও তেমনি। সেই সময় এই সাকীই আমায় রক্ষে করে। সাতদিন তার ঘরের মধ্যে দিবারাত্র লুকিয়ে ছিলাম। সেই সাতটি দিনে এই অচেনা মুসলমান মেয়েটির কাছে কত উপকারই যে পেয়েছি, তার ইয়ত্তা নেই। পালাবার দিন দেখা করব কথা দিয়ে এসেচি, কিন্তু এখনও সেটা রাখা হয়নি।

অ-দেখা মুসলমান মেয়েটির সম্বন্ধে কৌতুহল উগ্র হয়ে ওঠে। পুলিশের ভয় থেকে বাঁচাবার জন্যে যে অচেনা একজনকে আশ্রয় দিতে পারে, সে যে খুব সাধারণ নয় তা' বুঝতে পারি। তার সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে চাইলাম।

অশান্ত একটু চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, আশ্চর্য্য কি নিজেই

কম হয়েচি! কি আছে আমার! না শ্রী, না ছাঁদ। তবুও......
আশ্চর্য্য! হ্যাঁ, সাকীর পুরো নাম—সাকিনা। একটা বুড়ো, ধনী মুসলমানের সঙ্গে বছর দুই আগে তার বিয়ে হয়। মাস তিন হ'ল বুড়োর মৃত্যু হয়েছে। এখন সাকীই তার সব কিছুর মালিক!

অশান্তর কাছ থেকে জানা গেল, সেই সাকীর প্রথম চিঠি নয়, আগেও ওরা চিঠিপত্র লেখালেখি করেচে।

অশান্ত বল্‌লে, বিয়ে করবার সাহস বা সঙ্গতি কিছুই আমার নেই, আর সাকী চায় ঠিক ওইটেই।

বল্‌লাম, তোমার বাড়ীর এতে মত হওয়া শক্ত।

জবাব দিলে, ওঁদের মতামতকে আমি খুব অল্পই ভয় করি। ভারি ত' এক দূর সম্পর্কের কাকা। কিন্তু মুস্কিল এই যে, তাতে দশজনের কাছে ছোট হ'য়ে থাকতে হবে। আজ যাদের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করচি, তখন তারা ব্যঙ্গের বাণ ছুড়তে ইতস্তত: করবে না;—এমন কি তুমিও।

আপত্তি ক'রে লাভ নেই, সত্যিই, আমরা মুখে যত বড় বড়ই doctrine আওড়াই না কেন, মনে মনে সবাই আছি অনেক পিছিয়ে।

জিজ্ঞাসা করি, তা' হ'লে কি করতে চাও?

—কিছুই ঠিক করতে পারিনি। মোটের উপর সত্যি কথা, ওকে ছাড়বার সাহস আমার নেই। ওর চোখ দুটো আশ্চর্য্য—অদ্ভুত! ওই আমার কবিতা, ছন্দ—সব।

অশান্তর মত ছেলের ভিতরেও এতখানি কাতরতা লুকান থাকতে পারে! বসে রইলাম মাথা হেট ক'রে।

বল্‌লে, চিঠির জবাবে কি লিখি বল্‌ত?

ভারি বিব্রত হ'তে হয়। অশান্তকে উপদেশ দেব আমি? কিছুই বল্‌তে পারলাম না। ঘরের মধ্যে নিষ্করুণ একটা নিঃশব্দতা গুম্‌রে উঠে।

অশান্ত কি যেন ভাবছিল, হঠাৎ চম্‌কে উঠে বল্‌লে, আমার জন্যে সাকীকে দশজনের কাছে বড় কম সহ্য করতে হয়নি। গ্রামের মধ্যে ওর আর মুখ দেখাবার উপায় নেই; কেননা, এক বিপদের দিনে এ নিরাশ্রয় মানুষকে সে আশ্রয় দিয়েছিল!—হাসিও পায়। এখন, এই লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার করার একমাত্র উপায় তা'কে বিয়ে করা।

বল্‌লাম, সেইটেই সব দিক দিয়ে ভাল—অবশ্য যদি তোমার সাহস থাকে।

অশান্ত মুচকে একটু হাসে, কথা বলে না। মোমবাতির শিখাটা হাওয়ায় কাঁপচে। ওর কথাই ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরি।

রাধুর কান্না শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হ'য়ে পড়লাম। সে কান্না শুধু বিগতের জন্য শোকাশ্রু নয়, আর একজনকে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছনা। উষাকে দেখলে তাঁর সর্ব্ব-শরীর যেন জ্বলে ওঠে!

পোড়াকপালী মেয়েটা যেন তার নিজের হাতে এবং নিজের ইচ্ছায় 'ললাটে' আগুন ধরিয়েচে!—এমনিই কথার ভাবখানা। শুনেচি রাধু ঠাক্‌রুণের কপালও খুব বেশী বয়সে পোড়েনি; হয়ত' সে সব কথা তাঁর মনে প'ড়ে যায়। কিন্তু উষা এই অভিযোগ ও লাঞ্ছনার মানে বুঝতে পারে না। ওর ছেলেবয়সের কত সখীই ত' পথ-জনতার মাঝে কে কোন্‌খানে রয়ে গেছে। এও যেন তেমনি! কিন্তু তার জন্যে এত শোক, এত কান্না কিসের? কেন? দু'টি বোবা-চোখের অশ্রু-হীন দৃষ্টি যেন দূর আকাশের কোলে এর উত্তর খুঁজে বেড়ায়। কতদিন ছাদের উপরে সন্ধ্যার অনতি-গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে উষাকে একা চুপ ক'রে বসে থাক্‌তে দেখেছি। ওর স্তব্ধ দু'টি চোখ যেন সন্ধ্যা-তারার মিতা; তাকেই ও তার অভিযোগ জানায়।

সেদিন রামবাবু ডেকে বল্‌লেন, এমনি করে মেয়েটা বাঁচবে ব'লে মনে হয় না। অথচ, দিদির সঙ্গে ঝগড়া ক'রেই বা লাভ কি? ভাবচি মেয়েটাকে নিয়ে দু'চার মাস কোথাও ঘুরে আসি।

বললাম, বেশ ত', এতে আর বাধা কোথায়?

রামবাবু বল্‌লেন, বাধা ওই দিদি। ভাবচি তিনি এখন এইখানেই থাকুন, বাসাও থাক্‌বে। আমরা ফিরে এলে ওঁকে না হয় দিন কতক কাশীতে পাঠানো যাবে।

শেষ পর্য্যন্ত তাই হ'ল বটে। রাধু ভ্রাতৃ-নিন্দায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠলেন। নিতান্ত মায়ের পেটের ভাই বলেই তিনি এখনও এ ঝাঁটা-লাথি সহ্য ক'রে এখানে পড়ে আছেন ; নইলে শ্বশুর-বাড়ী গেলে তাঁর দেওররা নাকি এখুনি ওঁকে জায়গা দেয়।

মায়ের কাছেও ক্রমাগত অনুযোগ করতে লাগলেন, তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্যেই উষাকে এই ভাবে নিয়ে যাওয়া ; অথচ, তাঁর পক্ষের দোষ নেই এতটুকু।

অর্থনীতি সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে গিয়ে, সত্যিই ঘেমে উঠল—গরমে। কলেজে একটা ত্রৈমাসিক পরীক্ষা আসন্ন, ফাঁকি দেবার উপায় ছিল না, কেন না বাৎসরিক ফলাফল অনেকটা নির্ভর করে ওরই ওপর। বিকালের আলোটুকু মুমূর্ষু হ'য়ে এসেছে, আর পড়া চলে না। বাইরে গিয়ে বেড়িয়ে আসবার মতো যথেষ্ট সময়ও হাতে নেই, রাষ্ট্র-বিবর্ত্তনের জটিল তত্ত্ব তখন মগজে জোঁকের মতই কামড়ে ধরেছে।

অতএব ছাতে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর রৈল না; যতটুকু খোলা হাওয়া পাওয়া যায়, ততটুকুই লাভ। ছাতের আলিসার ধারে পঞ্চমীর চাঁদের ভীরু হাসি ফুটিয়ে পড়েছে। সেই অস্পষ্ট

চন্দ্রালোকে দেখলুম, শুভ্র একটি কিশোরী মূর্ত্তি—উষা। উষাও তখন একলাটি ছাতে আশ্রয় নিয়েচে—বুঝি সবার অগোচরে, সংসারের অগোচরে।

পাশের বাড়ীতে সমারোহের অন্ত নেই।—ফুল, আলো, শঙ্খধ্বনি, উৎসব-কলরব। প্রতিবেশী মেয়ের বিয়ে। মেয়েটি হয়তো উষারই সমবয়সী, কিম্বা বড়ও হবে দু'এক বছরের। কিন্তু আশ্চর্য্য, উষার দৃষ্টি সে দিকে নয়—আকাশের বিস্তীর্ণ শূন্যতার দিকে। ওর দাঁড়াবার ভঙ্গীটি অবধি কেমন যেন উদাস করুণ, জীবন-পথের সুরুতেই যেন ক্লান্তি এসেচে। উষার মধ্যে আমি বন্দিনী ব্যথিতা ভারতবর্ষের প্রতিমা দেখলাম, বাণী-ব্যাকুল মূক মাটিকে,—দেখলাম অশান্তর ভারতবর্ষকে।

ভারি ইচ্ছে কোমল ক'রে উষার সঙ্গে দুটো কথা কই।—কথায়, সুরে, হাসিতে, আলোয় ওর একলা অবকাশটিকে যদি মুখর ক'রে তুলতে পারি! আচ্ছা, ধীরে এগিয়ে গিয়ে ওর ক্লান্ত কপালে একটু স্নেহস্পর্শ দিলে, তা'তে কি এমন আসে যায়?

কাছে গিয়ে ডাকলুম, একলাটি দাঁড়িয়ে যে উষা?

উষা চমকে ফিরে চাইলে,—কে অজয়দা? ওমা তুমি যে ছাতে! পড়াশুনো নেই বুঝি? কী যে দিন রাত মোটা মোটা বিচ্ছিরি বইগুলো কোলে ক'রে থাক—আমার ত' দেখলেই গায়ে জ্বর আসে!

বললুম, তাই তো খোলা হাওয়ায় জ্বর ছাড়াতে এলুম। কিন্তু তুমি এখানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে যে!

উষার মুখের চেহারা বদ্‌লে গেল। খানিক থেমে বল্‌লে, এম্‌নিই। এসেছিলুম বিয়ে দেখতে, কিন্তু ভাল লাগল না কিছু। —আচ্ছা, কেন এমন হয় অজয়দা, এক এক সময় কিছু ভাল লাগে না, কেমন একলা, ফাঁকা মনে হয়, কেন?

নিজের সত্তাকে উষার আবার মনে প'ড়ে গেল। ভালো-লাগার পালা জীবনে ওর যে ফুরিয়ে গেছে, আজ পর্যান্ত সেই কথাই ও শুনে এসেচে।

বল্‌লুম, মানুষের মনটা বড় খামখেয়ালী উষা—

সে-কথায় কান না দিয়ে উষা বল্‌তে থাকে,—আচ্ছা, কি এমন দোষ করি আমি যে, পিসিমা যখন তখন আমায় বকে! কোনো কথারই ত' অবাধ্য হই না, তবু......এই দেখনা, কাল দুপুর বেলা একলা ঘরে বসে বাবার লাল কালির দোয়াতটা নিয়ে পায়ে আল্‌তা পরছিলুম, পিসিমা দেখে কত বক্‌তে লাগ্‌ল; বল্‌লে, আমি বেহায়া, আমার পাপের সীমা নেই! কেন, ও বাড়ীর রাণীদিও ত' আল্‌তা পরে রোজ। লুকিয়ে লুকিয়ে পরলেই বুঝি পাপ হয় অজয়দা'?

বল্‌তে বল্‌তে উষার গলা কেঁপে যায়।

বেদনায় সমস্ত মনটা স্তব্ধ হ'য়ে গেল। ওর প্রশ্নের কী-ই বা উত্তর দেওয়া যায়? ওর স্বামীর চিতার সঙ্গে সঙ্গে ওর অস্ফুট কৈশোরের আশা আকাঙ্ক্ষাও যে ছাই হ'য়ে গেচে, ও তা' জানে না! ওর নিষ্কলুষ মন পাপকে এখনও চেনেনি, এই ওর দোষ! ওর সবচেয়ে বড় অপরাধ, ও বাংলা দেশের মেয়ে।

বল্‌লুম, এখানে তুমি থাকৃতে পারবে না উষা। বিদেশে যাবে বেড়াতে ?

দুই চোখ আগ্রহে ভ'রে উষা ব'লে উঠ্‌ল, যাব, কোথায় ?

—পশ্চিম ; ধর পুরী, কি সারনাথে।—সেদিন রামবাবু এই কথাই বল্‌ছিলেন।

—সত্যি, বাবা যাবেন ? আমাকে নিয়ে ?

খুসীতে উষার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। বালিকা উষা—বনহরিণী উষা !

—পুরী বুঝি খুব দূরে, অজয়দা' ? আচ্ছা, সমুদ্দুরের ঢেউ কতো বড় ?............সেবাকে কিন্তু এবার আমাদের সঙ্গে পাঠাতে হবে, ব'লে রাখচি.........

ঠিক করলুম, এবারে সত্যিই অমত করব না। সেবা যদি ওর নিঃসঙ্গ প্রহরে আনন্দের ক্ষীণতম গুঞ্জনও তুল্‌তে পারে, তবে তুলুক্ না ; সংসারের অন্ধ সংস্কার থেকে মুক্তি পেয়ে, উদার আকাশের নীচে সেই সমুদ্র-বেলায় দাঁড়িয়ে উষা বুক ভ'রে নিঃশ্বাস নিক্। উষা বাঁচুক্।

অশান্তর ভারতবর্ষকে আমি উষার মধ্যে দেখতে চাই ; হাতে কঙ্কণ নয়, বজ্রাগ্নি-দীপ ;...নেত্রে তড়িৎ-শিখা, ললাটে মুক্তির মহিমা !

সেদিনের প্রতীক্ষায় আমি আমার ধ্যানলোকে বন্দিনী উষার জন্যে একটী সিংহাসন ক'রে রাখলুম।

ওদিকে তখন –

পাশের বাড়ীতে ঘন ঘন শাঁখ বাজচে। ব্যস্ততা ও কলরব একটা বিশেষ স্থানে এসে আবর্ত্তিত হ'চ্ছে মনে হ'ল। বর এসেচে, সন্ধ্যায় লগ্ন।

ছাতের আল্‌সের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে উষা বর দেখছিল। কণ্ঠে ওর কৌতুক-চাপল্যের অন্ত নেই; দেখে যাও অজয়দা, শিগ্‌গির দেখে যাও, বরের মোটর গাড়িটা ফুল দিয়ে কেমন ময়ূরের মতন সাজিয়েচে! বা-রে, মাথায় আবার একটা নীল আলো—

বরের মোটর ময়ূরাকৃতি কি-না, তা' প্রত্যক্ষ করবার ঔৎসুক্য অবিশ্যি আমার মনে জাগেনি। ভাবছিলুম, আজিকার এই উৎসব-চাঞ্চল্য আরেকটি এম্‌নি সমারোহময় সন্ধ্যার কথা ওকে স্মরণ করিয়ে দিয়েচে কিনা কে জানে! কিন্তু সুখ-সমারোহের যবনিকা যার চিরকালের জন্যে প'ড়ে গেচে, তা'রই চোখের সুমুখে একটি নব-নাটকের উদ্বোধন-উৎসবের চেয়ে করুণ পরিহাস আর কি থাক্‌তে পারে?

রাধুর কণ্ঠস্বর উষার কাণে না পৌঁছলেও, আমি শুন্‌তে পেলুম। কখন যে তিনি ছাতে ভিজে কাপড় মেলে দিতে এসেছিলেন, লক্ষ্য করিনি। উষাকে ডেকে বল্‌লুম, তোমার পিসিমা ডাক্‌চেন, যাও—

রাধু বোধ করি প্রথমটায় আমাকে দেখতে পান নি, আমার সাড়া পেয়েই সহসা আবক্ষ অবগুণ্ঠন টেনে দিয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলেন। উষা পিসিমার অনুসরণ করলে। রাধু যে এতটা

লজ্জাশীলা, আগে তা' জানতুম না। কিন্তু মিনিট দুই তিন পরেই নীচের তলা থেকে যে কণ্ঠস্বর কাণে এল, তা'র তীক্ষ্ণতার সঙ্গে অবগুণ্ঠনের আদৌ সঙ্গতি খুঁজে পেলুম না!

রাধু বল্‌ছিলেন,—

নিজের 'ললাটে' ত' আগুন ধরিয়েচিস্, আবার পরের ভালোর দিকে নজর দেওয়া ক্যান্ র‍্যা ভালোখাগী? পই পই ক'রে বারণ ক'রেচি, ওদের বাড়ীর পানে তাকাসনে,—এ অলুক্ষণে মেয়েকে নিয়ে আমি কি ক'র্‌ব মা!—

ঊষার ভয়-দুর্ব্বল কণ্ঠটি শোনা গেল না। হয়ত' বল্‌লে, রাস্তার ঐ কুঠে ভিখিরিটাও ত' তাকিয়েছিল, শুধু আমারই তাকানো বারণ?

রাধু ঠাকুরুণের গলাবাজী তখনও থামে নি; সহজে তিনি ক্লান্ত হন না। বল্‌ছিলেন,—

বলে দিইচি না, ভর সন্ধোবেলা ছাদে উঠ্‌বিনে! কী অত ফুস্-ফুস্ গুজ-গুজ হচ্ছিল শুনি? বুড়ো মাগী আমি, তবু এখনো মাথায় কাপড় না দিলে 'লজ্জা' করে, আর তুই হেসে হেসে .. কপাল না পুড়লে, এ্যাদ্দিন যে মা হতিস্ হতভাগী...হায়া নেই একটু? আসুক আজ রাম—

লজ্জায় ঘৃণায় সারা গা আমার তখন সঙ্কুচিত হ'য়ে গেছে। বাড়ীটার বিষাক্ত বাতাস থেকে মুক্তি পাবার জন্যে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। অনেক রাত্রি অবধি পথে পথে কেটে গেল। রাষ্ট্রবাদ ভুলে গেলুম, মনে হ'ল পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের চেয়ে

একটি বন্দিনী মেয়ের এক ফোঁটা চোখের জল ঢের বেশী দামী!—

সকালে রামতারণের ঘরে হাজির হলুম। খবরের কাগজ দেখছিলেন, পড়া যে হচ্ছিল না, বিজ্ঞাপনের পাতায় তাঁর স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টি দেখেই বুঝতে পারা গেল।

ভূমিকা করবার প্রবৃত্তি ছিল না; বললুম, একটা কথা আপনার কাছে বলবার আছে। কালকের ব্যাপার—

অত্যন্ত অপ্রতিভ হ'য়ে উঠ্‌লেন রামতারণ; কাগজ থেকে মুখ না তুলেই কুণ্ঠিত কণ্ঠে বল্‌লেন, হ্যাঁ, সে কথা থাক—বুঝলে কিনা—

—কিন্তু এর একটা ব্যবস্থা না করলে কালকের পর, একত্রে থাকা অসম্ভব হ'য়ে উঠবে রামবাবু। সন্দেহ আর সংস্কারের চেয়ে হানিকর কিছুই নেই। ঘরে আমারো মা-বোন রয়েচে, সুতরাং—

বিব্রত চোখ দু'টি তুলে রামবাবু বল্‌লেন, তাইতো, বড় মুস্কিলেই পড়েছি বাবা! মেয়েটাকে নিয়ে পুরীতেই চ'লে যাই—আজই। কি বল?

বললুম, বেশত'। স্বাস্থ্য এবং মন—দু'টোর জন্যেই বাইরের হাওয়া দরকার।

চটিজোড়া পায়ে দিতে দিতে রামবাবু ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন,—তাই যাব, গোছগাছ করে নিয়ে আজই বেরিয়ে পড়া যাবে। কি বল?

পুরী যাত্রার আয়োজন হ'তে লাগ্‌ল। রাধু স্বর্গীয়া 'ভাজে'র উদ্দেশে কান্নার সুরে অভিযোগ করলেন যে, সংসারে এত হেনস্তা সইবার জন্যে তাঁকে একলা ফেলে যাওয়ার কি দরকার ছিল?

সেবার উৎসাহের সীমা নেই। জীবনে এই প্রথম ওর রেলগাড়ী চড়া হবে।

সন্ধ্যার পর একখানা ভাড়া-গাড়ী ডেকে ষ্টেশনের দিকে রওনা হওয়া গেল। শেষের দিকে অপেক্ষাকৃত খালি একটা কামরায় ওঁদের বসিয়ে, ট্রেন ছাড়বার অপেক্ষায় রইলাম।

রামতারণ বল্‌লেন, সেবার জন্যে ভেব' না; পৌঁছেই চিঠি দেব।

ঊষা বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে রইল। কী কথাই বা তা'র বল্‌বার ছিল! ট্রেন ছাড়ল; সেদিন সেই জন-মুখর প্লাট্‌ফর্মে দাঁড়িয়ে নিতান্ত অকারণেই নিজেকে একলা মনে হয়েছিল। ট্রেন তখনো প্ল্যাট্‌ফর্ম ছাড়িয়ে যায়নি, সেই শেষ মুহূর্ত্তে যে লোকটি 'চেকার'কে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে ট্রেণ ধরলে, সুদীর্ঘ তেরো বছরের ব্যবধানেও তা'কে চিন্‌তে দেরী হ'ল না। ও প্রতুল—আমার বাল্যসহচর।

প্রতুল উঠল ঊষাদেরই কামরায়।

এর মধ্যে একদিন অশান্তর মেসে গিয়েছিলাম, দেখা পাইনি। শুনলুম, মেস ছেড়ে দিয়ে গেছে সে। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট্ ক্লাসেও বহুদিন তা'র পাত্তা পাওয়া যায়নি। ওর নতুন ঠিকানাও কেউ দিতে পার্‌লে না, কিন্তু ওর সম্বন্ধে যে খবরটা দিলে সেটা জান্‌তে চাইনি। মেসের দক্ষিণ-খোলা সব চেয়ে বড় ঘরখানা নৃপেশ রায় নামে যে লোকটি ভাড়া নিয়ে আছেন, পূর্ব্ববঙ্গে তাঁর নাকি মস্ত জমিদারী আছে। অশান্ত যেদিন মেস্ ছেড়ে চলে যায়, তা'র আগের দিন তাঁর নামে প্রায় হাজার পঁচিশ টাকা এসেছিল—কল্‌কাতার ব্যাঙ্কে জমা দেবার জন্যে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অশান্তর যাবার সঙ্গে সঙ্গে টাকাগুলোও নাকি অন্তর্দ্ধান করেচে!

সমস্ত মনটা তিক্ত হ'য়ে গেল। বিস্মিত হয়েছিলুম বটে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী পেলাম ব্যথা—অশান্ত সম্বন্ধে আমার নিজস্ব ধারণা ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল ব'লে। অশান্ত চোর, অথচ পাঁচটা টাকা একদিন সে চেয়েও নেয়নি!

কিন্তু কে জান্ত' দু'দিন বাদেই ওর সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাবে! দেখা হ'ল বাস্-এ; সঙ্গে ওর এক বোঝা নতুন কাপড়, নানা রকম ওষুদের শিশি-পত্র।

অবাক্ হ'য়ে বল্লুম, অশান্ত! এতদিন পরে!

হেসে অশান্ত বল্লে, একটু ব্যস্ত ছিলুম এতদিন। মেছো-বাজারের মেস ছেড়ে দিয়েছি, জানিস্ বোধ হয়?

মনটা ছোট হ'য়ে গেল। বল্লাম, হ্যাঁ জানি। যা' জান্তে চাইনি, তা'ও জান্তে হ'ল।

আশ্চর্য্য, অশান্তকে একটুও বিচলিত হ'তে দেখলাম না! অত্যন্ত সহজ ভাবে হেসে বল্লে, এতে অবাক্ হবার কি আছে? পৃথিবীতে থাক্‌তে গেলে অনেক কিছুই জান্তে হয়। কিন্তু সব কথা বল্‌বার সময় ও সুযোগ আপাতত আমার নেই। চল্‌না আমার সঙ্গে, একটু ঘুরে আস্‌বি—ভয় পাবার কোন কারণই নেই; কারণ, যেখানে যাব, সেটা রুগ্ন মজুরদের একটা হাস্‌পাতাল।

আপত্তি করতে পারলুম না। বেলেঘাটার মোড়ে নেমে ওর অনুসরণ কর্‌লাম। হঠাৎ অশান্ত শুধোলে, আমার ওপর তোর ঘেন্না ধ'রে গেচে, না রে অজয়?

বল্‌লাম, ধরাই উচিত নয় কি? কেন তুমি চুরি ক'রতে গেলে—নৃপেশ বাবুর টাকা?—

অশান্ত এবার বাধা দিলে, নৃপেশবাবুর টাকা! কথাটার মানে বুঝিস্?

একটু উষ্ণ কণ্ঠেই বল্‌লুম, নৃপেশের নয় ত' কার? তাঁরি ত' জমিদারীর খাজনা—

মাথা নাড়তে নাড়তে অশান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বল্‌তে লাগ্‌ল, না, টাকা নৃপেশের নয়; টাকা তা'র গরীব প্রজাদের, উপোসী চাষীদের। এ বছর অনাবৃষ্টিতে অর্দ্ধেক ফসল শুকিয়ে জ্বলে গেচে, চাল আর পাটের দর গেছে অসম্ভব নেমে; সম্বচ্ছর রক্ত জল ক'রে খেটে যা' দু'পয়সা পেয়েচে, জমিদারের খাজনা দিতেই তা' গেচে ফুরিয়ে! তোদের বড়লোক জমিদার কেমন ক'রে খাজনা আদায় করে শুনবি?—পাইক দিয়ে জুতোপেটা করিয়ে, তা'দের বৌ-বোন্‌কে বেইজ্জৎ করবার ভয় দেখিয়ে! অজয়, আমি যদি চুরি ক'রে থাকি, নৃপেশ করেচে ডাকাতি।

চেয়ে দেখি, অশান্তর চোখ দুটো অদ্ভুত আলোয় জ্বল্‌চে। বল্‌লুম, স্বীকার না হয় করচি নৃপেশ ডাকাতি করেচে, কিন্তু তা'তে তোমার চুরির কলঙ্ক ঢাকা পড়ে না; তুমি কেন সেই টাকা চুরি করলে?

অশান্ত বল্‌লে, জমির খাজনা আর মহাজনের সুদের দায়ে নির্ব্বোধ চাষীগুলো সর্ব্বস্বান্ত হ'তে বসেছিল; বিশ হাজার টাক দিয়ে আমি তা'দের জন্যে একটা কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক ক'রে দিয়ে

এসেচি। বাকী পাঁচ হাজার আমার দরকার ছিল—অসহায় রুগ্ন মজুরদের একটা আস্তানা তৈরী করবার জন্যে।

মন থেকে সংশয়ের মেঘটুকু তবু কিছুতেই মোছে না। বল্‌লাম, কিন্তু চুরি ছাড়া কি অন্য পথ ছিল না?

ঘাড় নেড়ে অশান্ত বল্‌লে,—না, কেড়ে নিতে গেলে নৃপেশ পুলিশ ডাকৃত, ভিক্ষে চাইতে গেলে চাকর দিয়ে তাড়িয়ে দিত।—আর, ভিক্ষেই বা কিসের জন্যে?

হঠাৎ অশান্তর কণ্ঠে যেন জোয়ার জাগে। বলে, চিরদিন ওরা মুখ বুজে থাকৃবে না অজয়।—যেদিন ওরা বুঝবে টাকা ওদের, সেদিন আস্‌বে চুরি নয়, ভিক্ষে নয়—দাবীর পালা।

বড় রাস্তা ছেড়ে অশান্ত একটা খোয়া-উঠা সরু গলি ধর্‌লে,—অত্যন্ত নোংরা। দু'পাশে খাপরার সারিবন্দী ঘর; নীচু শ্রেণী কুলি মজুরদের আস্তানা নিশ্চয়। বেলা তিনটে বেজে গেচে। সরকারী কলের পাশে নানা জাতের ও নানা বয়সের মেয়ে পুরুষের জটলা। আলাপ আলোচনা ও বচসা যে-ভাষায় চল্‌ছে, তা' শুন্‌লে কানে আঙ্গুল দিতে ইচ্ছে হয়। অশান্তর পিছু পিছু যেখানে এসে থাম্‌লুম, সুমুখে তার মস্ত লম্বা একটা আট-চালা গোছের ঘর, করোগেটের ছাউনি।

অশান্ত ভেতরে ডাক্‌লে, আয়—

ভেতরে সারি সারি তক্তাপোষের ওপর জন পঁচিশ তিরিশ স্ত্রী-পুরুষ শুয়ে। কারুর হাত কাটা, কারুর পা বরবাদ্‌,

কারুর বা কঙ্কালসার দেহ বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গেচে। চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বছর চোদ্দ-পনেরোর একটি ছেলে অস্ফুট স্বরে কাৎরাচ্ছিল। কুলী-শ্রেণীরই কয়েকটি স্ত্রীলোককে রুগীদের পরিচর্য্যা কর্‌তে দেখ্‌লাম।

অশান্ত কাপড়ের বোঝাটা নামিয়ে একটা আধাবয়সী স্ত্রী-লোককে ডেকে বল্‌লে, যাদের দরকার, তাদের বিছানায় নতুন চাদরগুলো পেতে দাওতো বিনোদের মা!

তারপর, সেই ছেলেটির পাশে বসে তার চোখের ব্যাণ্ডেজ খুল্‌তে খুল্‌তে বল্‌লে, একটা বড় গাম্‌লায় খানিকটা পরিষ্কার জল নিয়ে এসতো লক্ষ্মী!

কলাইকরা একখানা গাম্‌লায় জল নিয়ে যে মেয়েটি কাছে এসে দাঁড়াল, বয়স তার কুড়ির বেশী নয়। পরণে ডুরে শাড়ী, নাকে রূপোর একটা নাকছাবি। কালো হ'লেও লাবণ্য তার দেহে স্থির নদীর মতো টল্‌টল্ কর্‌চে। কিন্তু লক্ষ্য কর্‌লে দেখা যায়, সেই বয়সেই ওর মুখে ক্লান্তির ঘন ছায়া নেমেচে; চোখের কোলে অবগাঢ় কলঙ্কের স্পষ্ট রেখা।

পরিষ্কার জলে কি একটা 'পাউডারে' 'সলিউসন্' তৈরী কর্‌তে কর্‌তে অশান্ত লক্ষ্মীকে বল্‌লে, এবার যেতে পারো—

লক্ষ্মী তবু গেল না, সকুণ্ঠ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে অকারণে অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল। অশান্ত তা' লক্ষ্য করেছিল, বল্‌লে, কিছু বল্‌বার আছে লক্ষ্মী?

মৃদুস্বরে মেয়েটি জানায়, আপনার খাওয়া হয়নি এখনো।—

—হাঁা; একটু বেলা হয়েছে বটে!—অশান্তর হঠাৎ স্মরণ হ'ল। এই যাই, তারকের চোখটা ধুইয়ে দিয়েই যাচ্ছি। তোমার খাওয়া হয়েছে ত' লক্ষ্মী?

আনত মুখে মেয়েটি বল্লে, আমার তাড়াতাড়ি নেই।—আপনার ভাত কি এইখানেই আনব, না—

—না, না, আমিই যাচ্ছি এখুনি। কিন্তু এ তোমার ভারি অন্যায় লক্ষ্মী, আমার সঙ্গে তুমিও বৃথা উপোস ক'রে থাক কেন বল দিকি?

লক্ষ্মী ততক্ষণে স'রে গেচে। কয়েক মুহূর্ত্ত সেইদিক পানে অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে, অশান্ত বল্লে, মেয়েটাকে ঠিক বোঝা যায় না। যেদিন থেকে ওর সঙ্গে পরিচয়, সেদিন থেকে আমার খাওয়া-দাওয়া সুখ-সুবিধার দিকে অমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে কাউকে দেখিনি। আমার খাওয়ার আগে লক্ষ্মী খেতে বসেনা; বহুরাত্রে যখন ক্লান্ত হ'য়ে ফিরেচি, তখনও দেখেচি লক্ষ্মী জেগে আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য, অ-দরকারের সময় ওকে একটিবারও দেখ্‌তে পাই না—ডেকেও না!

জিজ্ঞাসা করি, ও করে কি?

—আপাততঃ এই রুগ্নদের পরিচর্য্যা, পূর্ব্বে গণিকাবৃত্তি।

কথাটা শ্রুতিসুখকর মোটেই নয়; খানিক চুপ ক'রে থেকে বলি, উঠি আজকে।—

অশান্ত ব্যস্ত ছিল, জবাব দিলে না। দাঁড়িয়ে উঠে ভাবছিলুম, আবার বলব কিনা। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে অশান্ত বল্লে,

সত্যিকার ভারতবর্ষ দেখবি ?—এরাই ভারতবর্ষ,—রুগ্ন বিকলাঙ্গ, উপবাসী। অথচ এদেরই 'সুহাসিনী' 'সুমধুর ভাষিণী' ব'লে, কবি কি ঠাট্টাই করেচে !

হা-হা ক'রে অশান্ত হেসে উঠল,—লোহার আওয়াজের মত কঠিন সে হাসি। তারপর, আমার কাঁধে একখানা হাত রেখে আস্তে আস্তে বল্‌লে, মানুষকে কখনো ছোট ক'রে দেখিস্‌নে অভয়, ওদের দুঃখু বোঝবার চেষ্টা করিস্‌, তা' হ'লেই ওদের সত্যিকার পরিচয় পাবি।—

অকস্মাৎ দেখি, ওর চোখ দুটো জলে ভেসে গেচে। অদ্ভুত ওর হাসি, কিন্তু তার চেয়েও অদ্ভুত ওর অশ্রু !

আস্‌বার সময় বল্‌লে, খোঁজ-খবর আমার এই হাঁসপাতালেই পাবি। আচ্ছা, আয়।—

রাত্রে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুম এল না।

মনে হ'তে লাগল, গরীব ঘরের একটি ম্লানমুখী মেয়ে এসে আমার শিয়রে দাঁড়িয়েচে। ওর কপালে রক্তের দাগ, চোখে জল, ছিন্ন আঁচলে ধুলো লেগেচে। করুণ কণ্ঠে বল্‌চে, 'আলো চাই, অন্ন চাই, মুক্তি চাই—।' মুখ তার কখনো বিধবা উষার মতো, কখনো বা গণিকা লক্ষ্মীর মতো !

বন্দিনী ভারতের প্রতিমাকে অশান্ত আমায় নতুন ক'রে চিনতে শিখিয়েচে ; অশান্তর আলো দিয়ে সত্যিকার ভারতবর্ষকে দেখলাম। ওকে নমস্কার।

অনেক রাত্রি অবধি জেগে রাষ্ট্র-বিবর্ত্তনের তত্ত্ব ঘাঁট্‌লুম—নব নব রাজ্য গঠনের ইতিহাস, অর্থনীতির নবাবিষ্কৃত তথ্য। কিন্তু প্রশ্নের মীমাংসা হ'ল কই ? রাষ্ট্র বিবর্ত্তনের ফলে রাজপরিবর্ত্তন হয়েচে বটে ; কিন্তু পতিত মানুষেরা কতটুকু মুক্তি পেয়েচে, ওদের দুঃখ বেদনা কতখানি ঘুচেছে ? ঘুমের ঘোরে শুনি সেই অশ্রুমুখী মেয়েটি বল্‌চে, 'ভারতের তেত্রিশ কোটি মানুষের মুক্তি না হ'লে, আমাদের মুক্তি হবে কেমন ক'রে !'

ঠিক্ কর্‌লুম, কাল গিয়ে অশান্তকে জানিয়ে আস্‌ব, আমি তোমাদের দলের।

ওর সঙ্গে দেখাও করেছিলাম, কিন্তু ও ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, সময় এখনো হয়নি অজয়! প্রেরণা যেদিন সত্যিই জাগবে, সেদিন আপনা থেকেই তুই মিশে যাবি আমাদের দলে, সেদিন নোটিশ দিয়ে আস্‌তে হবে না।

পুরী থেকে রামতারণ বাবু চিঠি দিয়েছেন। খবর মোটামুটি ভালই। উষার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে বলে মনে হয়; সামান্য একটু সর্দ্দি-কাশি ছাড়া রামবাবুর শরীরেও আর কোনো উপসর্গ নেই। সমুদ্র দেখে সেবার কী আনন্দ! চিঠির শেষ দিকে একটি নব পরিচিত ছেলের কথা লিখেচেন।—ভারি অমায়িক ছেলেটী, দু'বেলা এসে গল্প ক'রে যায়। সে নাকি আমায় চেনে, নাম প্রতুল। কল্‌কাতায় গিয়েও প্রতুল মাঝে মাঝে দেখা করবে, বলেচে।

প্রতুলও তা' হ'লে পুরীতেই গিয়ে উঠেচে? রামবাবুর চিঠির একটা জবাব লিখছিলুম, বাইরে কে ডাক্‌লে,—অজয় আছিস্?

অশান্তর গলা! ভেতরে ডেকে বসাই।

বল্‌লে, বিশেষ দরকারে এলুম, একটা জরুরি কাজ তোকে কর্‌তে হবে।

শুধোলাম,—কি. শুনি?

অশান্ত বল্‌লে, হঠাৎ আজ সাকী লিখেচে, আমায় যেতে হবে; একটু বিপদে পড়েচে সে। অথচ, আমার যাওয়া অসম্ভব; নৈহাটী মিলের কুলীরা ধর্ম্মঘট করেচে, এই সময় আমি না থাক্‌লে ব্যাপারটা একদম বিশৃঙ্খল হ'য়ে যাবে। যাওয়া আমার হ'তেই পারে না; সুতরাং যেতে হবে তোকেই—আজই।

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লাম, তা' কি ক'রে সম্ভব! সাকিনার সঙ্গে আমার কস্মিনকালেও দেখা পরিচয় হয়নি—

পিঠ চাপড়ে অশান্ত বল্‌লে, কিছু ভাবিস্‌নে, অশান্তকে সে চেনে, অশান্তর বন্ধুকেও চিন্‌তে তা'র কষ্ট হবে না। হ্যাঁ, গুরুতর কিছু ঘট্‌লে খবর দিস্, যাবার চেষ্টা কর্‌ব।

বল্‌লাম, কিন্তু সাকিনা তোমাকেই ডেকেচে অশান্ত!

অশান্ত নিঃশব্দে একটু হাস্‌লে। তারপর বল্‌লে, সাকীর বাড়ীতে যেদিন ঢুকেছিলুম, সেদিন ওর ডাকের অপেক্ষা করিনি; আজ ডাক পেয়েই যে যেতে হবে, তারও কোনো মানে নেই।

যাবার সময় অশান্ত আমার হাতে খানকয়েক নোট গুঁজে দিয়ে বল্‌লে, এগুলো রেখে দে, কাজে লাগবে।

আপত্তির কথা তুল্‌তে গেতেই, ও বল্‌লে, আমার দেবার

ক্ষমতা নেই, সাকীই এগুলো পাঠিয়েচে; চল্লুম, শিবপুর যেতে হবে এখুনি।—

কোনো আপত্তিই অশান্তর কাছে টেক্‌তে পারে না, জানি। তা' ছাড়া, অ-দেখা অ-সাধারণ সাকিনার সম্বন্ধে মনের মধ্যে বেশ একটু কৌতূহল বহুদিন ধরে ছিল। যাত্রার উদ্যোগ কর্‌তে হ'ল। পুরাণো চাকর রঘুকে বাড়ীর ভার দিয়ে টাইম্‌-টেবেল্‌ দেখতে বস্‌লাম। অভিভাবক কেউ রইল না ব'লে মা প্রথমটায় আপত্তি করেছিলেন; দু'চার দিনের ভেতরেই ফির্‌ব ব'লে আশ্বাস দিলুম।

চট্টগ্রামে সাকিনাদের গাঁয়ে যখন পৌঁছলাম, ভোর হ'য়েচে তখন। চিরকাল সহরবাসী আমি, পাহাড়ী দেশে সূর্য্যোদয়ের এমন অপূর্ব্ব গরিমা এর আগে আর চোখে পড়েনি। লুঙ্গি পরা চাষী শ্রেণীর একজন মুসলমান এদিকে আস্‌ছিল; শুধোলাম, সাকিনা বিবির ঘর কোথা বল্‌তে পার বড় মিঞা?

মিনিট দুই তিন লোকটা বোকার মত ফ্যাল্‌ফ্যালিয়ে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ ব'লে উঠল,—অ? বদ্‌রু সাহেবের জরু? তাই কও। ওই পীর-দর্‌গার সুমুকে কোঠা দালান—ওইডে।

জানতে চাই, বিবি কি এক্‌লাই থাকেন?

—একা বৈকি! বদ্‌রু সাহেব বেহেস্ত পাওয়ার পর, তেনার বিবি আর নেকা কর্‌তি চাইলে না। গাঁয়ের লোক বলে, কল্‌কাত্তাই এক ছোঁড়ার সাতে তেনার আস্‌নাই হ'য়েছিল,

তাই আর নেকা কর্‌তি চায় না।—তা, এবার নেকা হবে আমাদের চৌধুরী সাহেবের পোলার সাতে—

মিঞা সাহেবকে সেলাম দিয়ে এগোলাম। ব্যাপারটা জটিল ঠেক্‌তে লাগল। চৌধুরী পুত্রের সঙ্গে সাকিনার পুনঃ পরিণয়ের কথাবার্ত্তা যদি স্থির হ'য়ে গিয়েই থাকে, তবে তার মধ্যে সাকিনার বিপদ কোথায় এবং অশান্তকেই বা ডেকে পাঠাবার প্রয়োজন কি?

অদূরে পীরের সাদা দরগাটি প্রভাত রৌদ্রে ঝল্‌মল্ কর্‌ছে, তারই হাত পঁচিশেক তফাতে প্রকাণ্ড এক কোঠা বাড়ী। প্রাচীন হ'লেও দামী শালের মতোই প্রাচীন, বিগত কালের ঐশ্বর্য্য-শ্রী বেশ চেনা যায়।

বাইরে দাঁড়িয়ে কা'কে ডাক্‌ব মনে করচি; দেখি একজন চাকর বেরিয়ে আস্‌চে। ডেকে বল্‌লাম, বিবিকে গিয়ে বল্‌গে যে, কল্‌কাতা থেকে আমি এসেচি, অশান্ত রায় আমায় পাঠিয়েচে।

চাকরটা ভেতরে চলে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এসে বল্‌লে, বাড়ীর ভেতরে চলুন; খানা-পিনা ক'রে নিন্ আগে, দুপুরে বিবির সঙ্গে কথা হবে'খন।

দুপুর বেলায় বিশ্রাম-প্রহরে দেখা হ'ল। রূপ সাকিনার ছিল বৈকি, কিন্তু তার চেহারায় তা'র চেয়ে বেশী ছিল অসাধারণতা। পথে ঘাটে যে-সব মেয়ে আমাদের চোখে পড়ে, সাকিনাকে তাদের দলে ফেলা যায় না। ওর আয়ত কৃষ্ণতারা চোখে, চাপা ঠোঁটের রেখায়, সুগৌর ললাটে কী এক তপশ্চর্য্যার দীপ্তি লেগে

আছে। সাকিনা যদি হিন্দুর মেয়ে হ'ত, ওকে আমি অপর্ণার সঙ্গে তুলনা করতাম—যে অপর্ণা ধ্যানসমাহিত শিবের তপোভঙ্গের জন্যে তপস্যা করেছিল।

ভেবেছিলুম, ওড়না আর পরদার আড়ালেই সাকিনা বুঝি আত্মগোপন ক'রে থাকবে। তখনই কিন্তু সাকিনা এল ; পরণে শুধু সবুজ রঙের জামা ও কালা-পেড়ে সাদা শাড়ী একখানি। স্বল্প অবগুণ্ঠনের তলায় ওর অনাবৃত অসঙ্কোচ মুখখানির পবিত্রতা দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম।

মাথাটি ঈষৎ নত ক'রে অভিবাদন জানিয়ে সাকিনা বললে, আপনার খাওয়া দাওয়ার অসুবিধে হ'ল বোধ হয় ?

বললুম, কিছু না। বসুন আপনি।

সাকিনা বসলে পর, জানালাম, অশান্তর আসা আপাততঃ সম্ভব হ'য়ে উঠল না, একটা 'মিলের' হাঙ্গামে আটকে পড়েচে ; আমাকেই পাঠাল আপনার সাহায্যের জন্যে। আপনার আপত্তি না থাকলে, সমস্ত ব্যাপারটা জানতে চাই।

সাকিনা মুখ নত করলে ; খানিক থেমে মৃদুস্বরে যা' বললে তা এই :—

ওদের গ্রামের আবদুল আলি চৌধুরী প্রতাপান্বিত ভূস্বামী। আকবর তাঁরই একমাত্র ছেলে, বিলেতে গিয়েছিল ব্যারিষ্টারি পড়তে। সাকিনার বালিকা বয়সে এই আকবরের সঙ্গে ওর বিয়ের কথা হয়। আকবর যখন বিলেতে, ধনী প্রৌঢ় বদরু ওর বাবাকে টাকায় বশ ক'রে সাকিনার পাণি-পীড়ন করে। এ সমস্ত

বছর তিনেক আগেকার কথা। বদরুর মৃত্যুর পর সাকিনা আর বিয়ে করতে চায়নি। কিন্তু আক্‌বর বিলেত থেকে ফিরে এসে ওর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেচে। সাকিনার অবিশ্যি এ বিয়েতে একটুকুও মত নেই, তবে আবদুল আলির জেদের কাছে এ অমত যে কতদিন টিক্‌বে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ।

এই নিরুপায় মেয়েটির জন্যে সমবেদনা বোধ করি বটে, তবে আশ্চর্য্য হই না, একটুও। সাকিনা অশান্তরই কাছে আত্মদান ক'রেছে জান্‌তাম, কিন্তু এও জানি যে, সমাজের কাছে হৃদয়ের কোনো দামই নেই! শাসন হিন্দু-সমাজেরও যেমন নিষ্ঠুর, মুসলমান-সমাজেরও তেমনি নির্ম্মম!

ভেবে-চিন্তে বল্‌লাম, দেখুন, তৃতীয় ব্যক্তি হ'য়ে এ জটিল ব্যাপারের মীমাংসা কর্‌বার কোনো অধিকারই ত' আমার নেই। বরং অশান্তকে কাল সকালে একখানা টেলিগ্রাম ক'রে দিই, ওর আসা দরকার।

সাকিনা সায় দিলে।

বিকেলে আক্‌বর এসেছিল। দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ চেহারা, কিন্তু কেমন একটা উগ্র ঔদ্ধত্য চোখে কাঁটার মত ফোটে। পরণে ঢিলা পায়জামা আর চওড়া ডোরা কাটা চীনে ফ্যাসানের কোট, চোখে চস্‌মা, মুখে পাইপ।

চাকর এসে ফটকের কাছ থেকেই জানায়, বিবি এখন ব্যস্ত, দেখা করা সম্ভব নয়। জান্‌লা দিয়ে দেখি, আক্‌বর বাড়ীটার পানে চেয়ে একটু হাস্‌লে, তারপর পাইপটাকে স্লিপারের তলায় ঠুকে

ঝেড়ে, শিস্ দিয়ে একটা ইংরেজী গৎ বাজাতে বাজাতে চ'লে গেল—

কিন্তু টেলিগ্রাম করবার দরকার হ'ল না আর। সন্ধ্যার অস্পষ্টতায় একটি লোককে নিঃশব্দে বাড়ীতে ঢুক্তে দেখে, ভাল ক'রে চেয়ে দেখি—অশান্ত। ওর হাঁটু অবধি ধূলো, চুল রুক্ষ, চোখে শঙ্কিত তীক্ষ্ণতা।

আশ্চর্য্য হ'য়ে চেঁচিয়ে ডাক্তে যাচ্ছিলাম, অশান্ত!—

মুহূর্ত্তে পেছন ফিরে ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকিয়ে ও চুপ কর্‌বার সঙ্কেত কর্‌লে। তারপর কাছে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, ব্যাপার কি? জানিস্ ত' আমার এখন মর্‌বার সময় নেই; 'মিলের' কুলীদের ওপর আবার পুলিশের উপদ্রব হয়েচে।—

সাকিনার কথা খুলে বল্‌লুম। শুনে অশান্ত বল্‌লে, তা' আমি কি কর্‌তে পারি?

বল্‌লাম, সাকিনার এ বিপদে সহায়তা কর্‌তে পার একমাত্র তুমিই।

অশান্ত এবার গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে, অসম্ভব।

কিন্তু এ সম্বন্ধে সাকিনাকে একটিও কথা বল্‌তে শুন্‌লুম না।

অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাইরে ক্ষীণ চাঁদের অস্পষ্টতায় রাত্রির স্তব্ধতার কানে কানে হাওয়ার প্রলাপ। পাশেই অশান্তর ঘর। অশান্ত কা'কে যেন কি বল্‌চে, শুন্‌তে পেলাম :—

...তা' হ'তে পারে না। আক্‌বর ত' তোমার অযোগ্য নয়, সকল দিক্ দিয়েই তা'কে বাঞ্ছনীয় মনে করা উচিত।

—মান্‌লুম, তার যোগ্যতা আছে। কিন্তু সারা জীবন তার সঙ্গে মিথ্যা নিয়ে ঘর কর্‌ব?

নারীকণ্ঠ, সাকিনারই স্বর।

অশান্ত বল্‌লে, মিথ্যার আয়ু অপরিমিত নয়, আজকের মিথ্যা কালে সত্য হ'তে পারে বৈকি। দু'বছর পরে যে তোমাদের মনের মিল হবে না, এ কথা জোর ক'রে কে বল্‌তে পারে?

স্তব্ধতা।

হঠাৎ সাকিনা ব'লে ওঠে, কিন্তু একদিন তুমিই বলেছিলে, আমি তোমার কবিতা, কাব্যলক্ষ্মী।—

অশান্ত বল্‌লে, সেই জন্যেই ত'!—তোমায় স্মরণ ক'রে আমি কবিতা লিখি বটে, কিন্তু তোমায় ঘরে এনে আমি কাব্যলক্ষ্মীকে নির্ব্বাসন দিতে পার্‌ব না। আর, ঘরই বা কই আমার?

—কিন্তু আমি যে তোমায় আমার সর্ব্বস্ব দান ক'রে দিয়েচি —আমার দেহ, মন, সব।

সাকিনার কণ্ঠস্বর আবেগে সুরের মতো কাঁপতে থাকে।

—তুমি দান কর্‌লেই আমি যে তা' গ্রহণ কর্‌ব, আমায় এত কাঙাল ভাবচ কেন? দানের ওপর আমার লোভ আছে, এ তোমার ভুল ধারণা সাকী!

অশান্তর কণ্ঠ কঠিন, কর্কশ। একটি অস্ফুট আর্ত্তধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। সাকিনার মুখ বোধ হয় আঘাতে

বিবর্ণ হ'য়ে গেচে। অশান্তর আচরণে কোনো সঙ্গতি খুঁজে পাই না। যাকে ও ভালবাসে, তা'কে আঘাত দিতে ওর একটুও বাধে না!

সে রাত্রি বহুক্ষণ অবধি পাশের ঘরে একটি বিনিদ্র মানুষের পদশব্দ শুনেচি।

পরদিন সকালে অশান্তকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। সাকিনার মুখের চেহারা দেখে মনে হ'ল, একটি রাত্রির মধ্যেই যেন রজনীগন্ধার বনে ঝড় হ'য়ে গেছে!

ভোরের আলো ক্রমশঃ স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো, লোকজনের কল-কোলাহলে গ্রাম্য পথটি শব্দায়মান—কিন্তু অশান্তর আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। যেমন অকস্মাৎ তার আসা, তেমনি অকস্মাৎ তার যাওয়া—ঠিক যেন ঝড়ের মতো।

কিন্তু আমার যেন আর লজ্জার অন্ত রইল না। সাকীর সাম্‌নে আমি মুখ তুলে তাকাই কি ক'রে? সে নিজেও যেন পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেছে।

বল্‌লাম, আপনাকে সে কিছু বলে যায়নি? কোন কথাই নয়?

—না।

এরপর যে কি বলা যেতে পারে, তা' আর ভেবে ঠিক করতেই পারি না।

অনেকক্ষণ পরে সাকী নিজেই বল্‌লে, আচ্ছা অজয়বাবু, মেয়েমানুষকে ওঁদের এত ভয় কেন? মানুষের মুক্তি ওঁরা চান, কিন্তু স্ত্রীলোকের তার মধ্যে স্থান হয় না কেন?

লজ্জার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে বললাম, সে কী কথা! আপনারাও নিশ্চয়ই আছেন এর মধ্যে। নইলে আমাদের সমস্ত আয়োজনই যে বৃথা হ'য়ে যাবে।

সাকী একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বলে, ওটা ত মুখের কথা, ভদ্রতার কথা। মনের সঙ্গে তার যোগ কই? যোগ যদি থাকত, তা' হ'লে আমাকে পাশে নিয়ে কাজে নাম্‌তে আপনার বন্ধুটির কোন রকম কুণ্ঠা বোধ করা উচিত ছিল না।

আমি জানি অশান্ত স্ত্রীজাতিকে কত উঁচু ক'রে দেখে— এদের সম্বন্ধে তার কল্পনা কত অগাধ, ভালবাসা কত গাঢ়! কিন্তু আজ আঘাত-স্তব্ধ সাকিনার মুখের দিকে চেয়ে অকস্মাৎ মনে হয় যে, কোন আদর্শের দোহাই দিয়েই মানুষকে অবহেলা করা উচিত নয়। সাকীকে কি অশান্তর একেবারেই প্রয়োজন ছিল না? বোধ করি অশান্ত নিজেও এ কথাটা অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বে না। মাইলের পর মাইল খর রৌদ্রের মধ্যে পায়ে হেঁটে ও যখন বাসায় পৌঁছবে, তখন তার রুক্ষ, অগোছাল চুলগুলিতে একটু স্নেহস্পর্শ দেবার ভারও কি সাকিনা নিতে পারত না!.........কি জানি।

সমস্ত দিনটা অত্যন্ত অস্বস্তির ভিতর দিয়ে কাট্‌ল। সন্ধ্যার সময় সাকী বল্‌লে, ও আমার সঙ্গে কল্‌কাতায় যাবে। ভারি মুস্কিলেই পড়লাম। নিয়ে গিয়ে ওকে ঠাঁই দেব কোথায়? মুসলমান মেয়ে ব'লে জান্‌লে রাধু ত' সেইদিনই হ্যাওরকে স্মরণ করবেন; মার মুখও যে প্রীতিতে প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌বে, তাও ত' মনে হয় না।

কথার স্রোত ফেরাবার জন্যে বল্‌লাম, কল্‌কাতা ত' তোমাদের এই ছোট গ্রামটির মতো নয়। সেখানে তাকে পাবে কোথায়? কি করবে তুমি?

সাকী বল্‌লে, কি করি না করি তা' জান্‌বার দরকার নেই। আমায় নিয়ে যাবেন কিনা বলুন,—.

সাকীর কণ্ঠে কী অচলতা! প্রতিবাদ কর্‌তে পারলাম না; বল্‌লাম, তোমার যদি কোন বাধা না থাকে, তা' হ'লে আমারই বা আপত্তি থাক্‌বে কেন?

সাকী হাস্‌বার মতো ক'রে বল্‌লে, বাধা পদে পদে। চৌধুরী সাহেবের ছেলে আছেন, আরও অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন। কিন্তু সকলের শুভেচ্ছার বোঝা বয়ে বেড়াবার শক্তি আমার কোথায়?

কাজেই স্থির হ'ল যে, কাল প্রত্যূষে আমরা কল্‌কাতায় যাত্রা করব। আপাততঃ সাকী কোন হোটেলে গিয়ে আশ্রয় নেবে। নিতও তাই, কিন্তু হঠাৎ সব গোলমাল হ'য়ে গেল।

রাত্রি তখন আটটা। একটী ছোকরা—সেই দেশেরই লোক, হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে বল্‌লে, আপনার নাম অজয় বাবু?

নাম স্বীকার কর্‌তেই ছেলেটী একখণ্ড লাল কাগজ আমার হাতে দিয়ে বললে, আপনার নামে একখানা চিঠি আছে।

বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কোন্ দিকে গেল, কি করে গেল, কিছুই ঠিক কর্‌তে পারলাম না।

চিঠি অশান্তর। লিখেচে—

গত রাত্রির ব্যবহারে তোমরা নিশ্চয়ই ভারি আশ্চর্য্য হ'য়েছ। পুলিশের কৃপাদৃষ্টি এড়াবার জন্যে এসেছিলুম হঠাৎ, কিন্তু এসে দেখলাম যে, সাকীনার বাড়ীও আর আমার পক্ষে নিরাপদ নয়। অগত্যা পূর্ব্বেই সরে পড়লাম। কোথায় চললাম তা' বলবার উপায় নেই। কারণ, আমাদের দলের যে-গাঁয়ে যত সর্ব্বনাশ হয়েচে, তার প্রত্যেকটার মূলে আছে পরিচিত লোকের উৎকট শুভেচ্ছা। তবে এইটুকু বলে রাখি যে, আমার জ্ঞাত ও অজ্ঞাত গোটাদশেক অপরাধের সঙ্গে পুলিশ আমাকে জড়িয়েচে; এমন কি নরহত্যা পর্য্যন্তও আমাকে নাকি করতে হয়েচে—! সুতরাং কিছুদিনের মতো গা-ঢাকা দেওয়া ছাড়া কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। এই 'কিছুদিন' যে কতদিন, তাও ঠিক ক'রে বলবার উপায় নেই। আমি ইচ্ছে ক'রে ধরা দিতে চাই না; কেন না, আমার বিশ্বাস কোন অন্যায় কাজ আমি করিনি। যেদিন বুঝব আমি ভুল করেচি, অন্যায় করেচি, সেদিন ধরা দিতে আমার এতটুকুও ক্ষোভ থাকবে না।

অজয়, বোধ করি ব্যাপার দেখে ভারি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছ? আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই এর মধ্যে; এ বিয়ের এই মন্ত্র।

সাকী যেন আমার কথা ভেবে অকারণে কোন দুঃখ ভোগ না করে। আমাদের পথ দুর্য্যোগের রাতে—অন্ধকারে কাঁটা আর কাঁকরের মাঝখান দিয়ে। সে পথে আলো হয়ত' কখনও এসে পড়ে—কিন্তু সে আলোর কাছে যাবার সাহস আমাদের হয় না।

আমাদের পায়ে অফুরন্ত চলার পিপাসা। চলতে চলতে সে আলোক-শিখাটুকু এক সময়ে আর চোখে পড়ে না; আবার পথ চলতে হয়। সেই সুদূর দীপ-শিখাটুকু চোখের সাম্‌নে কখনও বা আলেয়ার মতো মোহ সৃষ্টি করে। আমরা বহুদূর-যাত্রী; নূতন বিশ্বের ভাবী বিধাতা আমরা—সে আলো বা আলেয়া আমাদের ভুলোতে পারে না।

আবার দেখা হবে। কারণ, অকারণে মর্‌তে চাই না ব'লেই এই আত্ম-গোপন। সাকীকেও সে কথা ব'ল। এবারের মতো এইখানেই।—অশান্ত।......

সাকীকে নিয়ে আর কলকাতায় আসতে হ'ল না। একটী বিরহ-বিদীর্ণ করুণ মুখের স্বপ্ন বুকে ক'রে পরদিন ষ্টীমারে উঠে বসলাম।

অশান্ত যেন আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেচে। তার রুক্ষ চুল, দীপ্ত দুটী চোখ,—আমার সামনে যেন জ্বলচে। ভাবছিলাম, হয়ত' কোন জনহীন গ্রামে, শ্মশানের মাঝে প্রেতের মতো একা বসে আছে, কিংবা কূলে কূলে ভরা কোন নদী সাঁতরে পার হচ্ছে—কে জানে?

এক বৎসর পরের কথা দিয়ে আজ আবার কথা আরম্ভ করতে হ'ল।

এই একটি বৎসরকে আমার জীবনের খাতায় বাজে খরচের কোঠায় ফেল্‌তে পারি। এই দিনগুলির মধ্যে আমি এমন বিশেষ কিছুই করিনি যা' বিশেষভাবে এখানে খুঁটিয়ে উল্লেখ করতে পারা যায়। কেবল একটিবার আমাকে পুরী যেতে হয়েছিল—রথ দেখতে নয়, সমুদ্র দেখতেও নয়, সেবাকে নিয়ে আস্‌তে। কারণ, ছ' মাস কাটবার পরেও যখন রামতারণের ফের্‌বার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন মা সেবার কথা ভেবে অস্থির হয়ে উঠলেন। দুষ্টু মেয়েটি তাঁর দুরন্ত সমুদ্রের সঙ্গে

মানিয়ে চল্‌তে পারবে কিনা, ভাবতে ভাবতে তাঁর চোখের ঘুম ফুরিয়ে যাবার উপক্রম হ'ল এবং তারই ফলে আমার পুরী যাত্রা।

ভিক্টোরিয়া হোটেলের দু'খানি ঘর নিয়ে রামবাবু বাস করচেন দেখলাম। সাম্‌নে, খানিকটা বালির রাশ পার হ'য়ে গেলেই ফেনিল সমুদ্র,—হোটেলে বসেই দেখা যায়। সমুদ্রের দিকে চেয়েই হঠাৎ, অনেকদিন পরে মনে পড়ল অশান্তকে। ওর সঙ্গে আমি যেন এই উচ্ছ্বসিত জলের সাদৃশ্য খুঁজে পাই; সমুদ্রের মতোই অশান্ত যেন তীর-বন্ধনের পায়ে মুক্তির জন্যে মাথা খুঁড়ে মরচে।.........কতদিন তার খোঁজ পাইনি।

এসে দেখলাম, মায়ের এবং রাধু ঠাক্‌রুণের সমস্ত আশঙ্কাই বৃথা। রামতারণ বেশ মনের সুখেই আছেন, শরীরে তাঁর একটু যেন লাবণ্যের আভাস আত্মপ্রকাশ করেচে। দেখা হ'তেই বল্‌লেন, এ' জায়গায় এসে আর ফিরে যেতে মন চায় না বাবা। বড় ভাল আছি।

সে কথা তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়।

ঊষা আর সেবা 'বীচে' বেড়াতে গিয়েচে, রামবাবু বললেন। সেবাকে নিতে এসেচি শুনে তিনি ত' হেসেই অস্থির।—বললেন, ও কিছুতেই যাবে না। দেখ তুমি কি করে ওকে নিয়ে যেতে পারো।

ঘণ্টাখানেক পরে ঊষা আর সেবার সঙ্গে যে ছেলেটী হোটেলে ঢুক্‌ল, তাকে একদিন হাওড়া ষ্টেশনে দেখেছিলাম।

এখানে আমাকে দেখে প্রতুলের বিস্ময়ের আর অন্ত নেই!

বললাম, চিন্‌তে পারো?

প্রতুল হাস্‌বার চেষ্টা করে বল্‌লে, অফকোর্স।

উষার দিকে চাইলাম। অত্যন্ত অকস্মাৎ এবং সকালে তার মুখে একদিন যে মালিন্যের ছায়া দেখা দিয়েছিল, তা' আর নেই। উষা যেন আবার তার শৈশব-লোকে ফিরে গেচে।

আমার পায়ের কাছে একটা প্রণাম করে বললে, প্রতুল দা'কে তুমি চেন বুঝি অজয় দা'?

—হুঁ, তোমায় চেনার ঢের আগে থেকেই। ট্রেনেই বুঝি এঁদের সঙ্গে তোমার আলাপ হ'ল প্রতুল?

প্রতুল কোন কথা বলবার আগেই রামতারণ বাবু উঠে বস্‌লেন, উৎসাহের বশবর্ত্তী হ'য়ে। বললেন, সে এক মস্ত বড় গল্প অজয়।—ছোট ক'রে বলি শোন।—যেদিন আমরা আসি, সেদিন ট্রেনে যে তিল রাখবার ঠাঁই ছিল না, সে তো তুমি নিজের চোখেই দেখে এসেছিলে। যা'ই হ'ক, ট্রেন ছাড়ব-ছাড়ব হ'য়েচে তখন তোমার প্রতুল এসে উঠ্‌লেন একেবারে আমাদেরই কামরায়। গাড়ী শুদ্ধ লোক একেবারে হাঁ-হাঁ করে উঠল। প্রতুল বেচারীর মুখ তো চূণ! কোথায় একটু আশ্রয় পাওয়া যায় সতৃষ্ণ নয়নে তাই শুধু চেয়ে চেয়ে দেখ্‌চেন। দেখে ভারি লজ্জা হ'তে লাগল। ডেকে ওঁকে বসতে দিলাম। অজয়, তুমি নিশ্চয়ই আমার স্বার্থত্যাগের প্রশংসা করবার উদ্যোগী হচ্চ;

কিন্তু সে অপরাধের শাস্তি যে কী পেয়েচি তা' শুন্‌লে তুমি অবাক্ হবে।

—অপরাধ কিসের ?

—অপরাধ—জায়গা দিয়েচি! শাস্তি দেবার জন্যে প্রত্যেক ষ্টেশনে উনি চা, খাবার, সরবৎ কিনতে লাগলেন ; সারা পথ আমাদের আর পয়সা খরচ করতে হ'ল না বললেই হয়।

প্রতুল বড়লোকের ছেলে ; পয়সার উপর তা'র মমত্ব বোধ অনেকদিন থেকেই নেই, সুতরাং বিস্মিত হ'লাম না। প্রতুল সেই থেকেই পুরীতে রয়ে গেচে, কল্‌কাতায় আর ফেরেনি। রামবাবু প্রতিদিন সন্ধ্যায় সামনের খোলা জানালা দিয়ে সমুদ্রের বাতাস এবং সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন, প্রতুল যায় সেবা আর উষাকে নিয়ে বেড়াতে।......মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা অগোচর অস্বস্তি গা ঘুলিয়ে তুলতে থাকে। উষার সেই সকরুণ মূর্ত্তি—যা'র দিকে চেয়ে হঠাৎ একদিন আমি বন্দিনী দেশ-রমণী এবং তপঃক্লিষ্টা অপর্ণার স্বপ্ন দেখেছিলাম, তা'কে আজ আর দশজনের মতো সুলভ হ'য়ে যেতে দেখে মোটে যেন খুসী হ'তে পারলুম না। অথচ উষা সুখী হ'ক্, তার ছোট ললাটে সূর্য্যোদয়ের আলো জ্বলে উঠুক্—এই ত' আমি চেয়েছি। তবে ?

যা'বার কথা শুনে সেবা ত' প্রায় ক্ষেপেই উঠল। সে কল্‌কাতায় ফিরলে আমরা বড়লোক হ'ব না যখন, তখন সে কল্‌কাতায় ফিরে যাওয়াটা দরকার বলেই মনে করে না।

কিন্তু মায়ের মন যে দরকার অ-দরকারের হিসেব ভাল বোঝে না,—সেকথা ওই ছোট মেয়েটিকে বোঝাই কেমন ক'রে ?

ঊষা, রায়বাবু, এমন কি প্রতুল—সবাই আমার বিপক্ষে। আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলাম। ক্রমাগত তিন দিনের চেষ্টার পর, এক সপ্তাহের মধ্যে আবার সেখানে রেখে যা'বার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেবাকে নিয়ে আমি যখন কলকাতা-যাত্রী গাড়ীর কামরায় উঠে বস্‌লাম, তখন ভাবতে পারিনি যে, ঊষাকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের কয়েকটী নর-নারীর জীবনে ভয়াবহ এক আবর্ত্ত গড়ে উঠচে। কিন্তু সে কথা পরে।

প্রতুলও ষ্টেশনে এসেছিল। বললাম, কবে ফির্‌চ— ?

উদাসভাবে প্রতুল জবাব দিলে, বিধাতার সৃষ্টির খাতায় আমরা বাজে খরচ, বে-হিসাব। যাওয়া বা না-যাওয়ার উপর কোন হাতই নেই।

দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা কর্‌বার মতো উৎসাহের একান্ত অভাব। একটু বিরক্ত ভাবেই বললাম, জীবনে সহজ হ'তে পারাটাও একটা ক্ষমতা ; অকারণে জটিল হ'তে যেয়ো না।

প্রতুল এটা আমার কাছ থেকে নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করেনি। খানিক স্তব্ধভাবে মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমিই এমনি হঠাৎ অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠ্‌লাম কেন, সেও এক বিস্ময় !

সারা পথ মনের মধ্যে অনুশোচনা ভোগ করেছি সে জন্যে।

প্রতুলের সঙ্গে এককালে আমার সখ্য ছিল সকলের চেয়ে বেশী।

তারপর আরো একটা বছর গেল। পুরী থেকে রামবাবুরা ফিরে এলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, সেদিনের উষার সঙ্গে আগেকার সদ্যবিধবা উষার কোন সাদৃশ্য নেই!—ও আর সন্ধ্যা-তারার মতো স্নিগ্ধ নয় —রক্ত-করবীর মতো উগ্র, চাঁপার গন্ধের মতো তীব্র! তা'র কথায়, তা'র ভঙ্গিমায় একটা মন্থরতা এসেচে। মনে হয়, নিজের ভারও যেন আর বইতে পার্‌চে না।

রাধু ত' সতেজ গলায় জানিয়ে দিলেন যে, এ-বাড়ীতে থাকা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। উষার দিকে চাইলে, তাঁর প্রাণ ছুর্‌ছুর্‌ ক'রে কেঁপে ওঠে। একি রাক্ষসী-রূপ…মাগো! ভাই যেন তাঁকে কাশীতেই পাঠিয়ে দেয়।

লক্ষ্য কর্‌লাম, পুরী থেকে এসে উষা আমার সঙ্গে একটী কথা বল্‌বার চেষ্টা পর্য্যন্ত করেনি। না করুক, তার জন্যে আমার দুঃখ করবার কি কারণ থাকতে পারে? অশান্তর চিঠির লাইন কটা মনে মনে আবৃত্তি করলাম,—আমরা বহুদূর-যাত্রী, নূতন বিশ্বের ভাবী বিধাতা আমরা; আলো বা আলেয়া আমাদের ভুলোতে পারে না।

বহুদিন অশান্তর বিশেষ কোন খপরই পাওয়া যায়নি। অথচ তার হাঁসপাতাল দিব্যি চলেচে, টাকা-কড়ির কিছুই অভাব নেই। একদিন হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলাম সেদিকে। লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা হ'ল।

বললাম, অশান্তর কোন খপর পেয়েচ—?

লক্ষ্মী বললে, একটি দিন এসেছিলেন—আধঘণ্টার জন্মে। মুখে একগাল দাড়ি, সন্ন্যেসীদের মতো লম্বা লম্বা চুল। বললেন, তোদের দেখতে এলাম লক্ষ্মী, আছিস্ কেমন তোরা?

—তারপর?

তারপর বললেন, আমার জন্যে ভাবিসনে তোরা; কাজ ঠিকই চলবে। যে জিনিষ সুরু ক'রে দিয়েচি, তা' আর মরবে না। আজ-কালকার বড়লোকেদের অনেকেই বুঝচে, মদ মেয়েমানুষ না নিয়েও টাকা খরচ করা চলে। তারাই চালিয়ে যাবে আমার কাজ।...আধঘণ্টা পরে সেই যে চলে গেলেন, তারপর আর ফেরেননি।

লক্ষ্মীর কথা শুনে মনে মনে ভাবলাম, মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু মানুষ নিজে; নইলে, অশান্তকে আজ চোরের মতো লুকিয়ে তার হাঁসপাতালের খোঁজ নিতে আসতে হ'ত না।

লক্ষ্মী বললে, অশান্তবাবু চলে যাবার দিন দুই পরে—হ্যাঁ দিন দুইয়ের বেশী হবে না—পুলিশের একটা লোক এসে বললে, কালো, দোহারা চেহারা, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, একটা লোক দু'চার দিনের মধ্যে তোদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল? বল্লাম, না। লোকটা একটু হেসে বল্লে, লোক ভাঙ্গিয়ে খাওয়াই ত' তোর ব্যবসা, সতী হ'লি আবার কবে? ঠিক করে বল অশান্তবাবু এখানে এসেছিল কেন? টাকা পাবি একগাদা।

ভয় পেয়ে বল্লাম, বলে ফেলনি ত' কোন কথা?

লক্ষ্মী হেসে বলেছিল,—টাকা পেলে লক্ষ্মী পারত না এমন কাজই নেই, কিন্তু সে লক্ষ্মী গেচে ম'রে।

লক্ষ্মীর কথা বিশ্বাস করতে আমার বাধেনি। অশান্ত নিজে ওকে গড়েছে।

উমার সম্বন্ধে কোন কথা ভাবতে চাইনি। কারণ তা'তে

আমার কাজ নেই। কিন্তু রামবাবু একদিন ঘরে ডেকে উষার কথা নিয়েই আলোচনা আরম্ভ করে দিলেন।

বললেন, মেয়েটার আবার যদি বিয়ে দেওয়া যায়, তা' হ'লে কেমন হয় অজয় ?

উষার বিয়ে! হ্যাঁ, অশান্ত থাকলে নিশ্চয়ই মত দিত। আমিও বল্‌লাম, আপনি ভাল বিবেচনা করলে, আপত্তি করবার কিছুই নেই। পাত্রও স্থির করেচেন নাকি ?

—না, না···অতদূর এখনো যাইনি। কথাটা মনে এল তাই বললাম। সত্যি বল দিকি অজয়, যে জিনিষটার কোন মানেই ও বোঝেনি, সেইটেকেই তা'র জীবনের ওপর শুধু বোঝার মতো চাপিয়ে রেখে লাভ আমাদের কি হবে? অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে একটা ভুল করেছিলাম বলেই কি, পরেও সেটা সংশোধন ক'রে নিতে পার্‌ব না ?

হয়ত' তিনি তা' পার্‌তেন, কিন্তু বাধা এল রাধুর তরফ থেকে—না এলেই আশ্চর্য্য হ'তে হ'ত।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি আমাদের কথা শুনছিলেন। ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে ঢুকে বললেন, হ্যাঁ রাম, বুদ্ধি শুদ্ধি কি তোর একেবারেই লোপ পেয়েচে! ওই মেয়ের আবার বিয়ে! তার আগে উষীকে বলো যে, কুট্‌নো-কোটা বঁটিটা সে যেন আমার গলায় বসিয়ে দেয়!......ছি, ছি, ঘেন্নায় মরি,— ঘেন্নায় মরি!

রামবাবু হাস্‌বার চেষ্টা ক'রে বললেন, মরে ত' ওই মর্‌বে,

তুমি মরতে যাবে কেন দিদি! বাঁচবার দরকার যে কেবল তোমাদেরই।

রামবাবুর কথার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ এবং জ্বালা ছিল, তা' বোঝবার শক্তি রাধুর ছিল না; না থাকাই স্বাভাবিক। বিধবা মেয়ের বিয়ে কতদূর ঘৃণ্য তাই প্রমাণ করবার জন্যে তিনি একের পর এক গল্প বল্‌তে সুরু ক'রে দিলেন এবং এ কথাও জানিয়ে রাখলেন যে, রাম যদি তাঁর মেয়ের আবার বিয়ে দেন তা হ'লে পিতৃপুরুষেরা তাঁর হাতের 'জল' আর গ্রহণ কর্‌বেন না।

সুতরাং সে আলোচনা সেদিন এইখানেই বন্ধ।

রামবাবুরা ফির্‌বার পর প্রতুল এখানে আসেনি। তবে সে যে কল্‌কাতায় ফিরেচে এ সংবাদ আমি রাখি। সেদিন সন্ধ্যার সময় বাড়ী থেকে বার হচ্চি, পিওন একখানা চিঠি এনে দিলে আমার হাতে। চিঠি উষার নামে। ইতিপূর্ব্বে উষার নামে কোনদিন চিঠি এসেচে বলে মনে করতে পারলাম না। চিঠি থেকে উগ্র সুগন্ধ বার হচ্চে—খামখানি নীল এবং কাগজটা এত পাতলা যে, ভিতরের কাগজখানি যে গোলাপী রঙের তা' বুঝতে আমার বেশী পরিশ্রম করতে হ'ল না। চিঠিখানি খুলে দেখবার ইচ্ছে হচ্ছিল অত্যন্ত বেশী রকম, কিন্তু নাড়াচাড়া করতে করতে ভিতরের কাগজের একটা কথার ওপর সহসা চোখ দুটো যেন বিঁধে গেল!

'প্রতুল।'

উষাকে চিঠি লিখেচে—প্রতুল, নীল খামে আর রাঙা

কাগজে! সে চিঠিতে উগ্র সুবাস! চিঠি কেন লিখেচে, তা'তে কি লিখেচে—সব যেন আমি বেশ বুঝতে পারলুম। পড়বার প্রবৃত্তি আর হ'ল না।

সেটাকে হাতে নিয়েই একেবারে উষার সাম্‌নে গিয়ে উপস্থিত। উষা তখন রান্নাঘরে তরকারী কুটচে।

আমরা একা।...এক বৎসর পরে দুজনে একা।

উষা মুখ তুলে চাইবার আগেই বললাম, তোমার জন্যে একটা ভারি দামী জিনিষ আনা গেচে, কি বখ্‌শিস দেবে বল ত'—?

উত্তর শোনবার আগেই, চিঠিখানা তার চোখের সাম্‌নে মেলে ধরলাম।

—কার চিঠি বলতে পার—?

—কা'র চিঠি!—উষা বিস্মিতের মতো বলে উঠল। যেন চিঠি পাবার কোন সম্ভাবনাই তার নেই।

ঠাট্টার সুরে বললাম, কা'র চিঠি তুমি জান না! ভেবে দেখনা একটু, ঠিক মনে করতে পারবে।

উষা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, সত্যি অজয় দা, আমায় আবার চিঠি লিখবে কে? আমি ত' কিছুই জানিনে।

উষার কথা আমি বিশ্বাস করিনি; বলেছিলাম,—তুমি জানো। চিঠি প্রতুলের। যার সঙ্গে এতগুলি সকাল-সন্ধ্যে সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়িয়েচ, সে কি তোমায় একখানা চিঠি লিখবার দাবীও রাখবে না? নিশ্চয়ই রাখ্‌বে।

ঊষার মুখের সেই মুহূর্ত্তটী আমার মনে আছে। মনে হ'ল তা'র চোখ দুটী হঠাৎ ছুরীর মতো চক্‌মক্ করে উঠলো...তারপর নির্ব্বোধের মতো অর্থহীন চোখ দিয়ে সে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল'। বুঝ্‌তে পারলাম না, অগ্রণী কে—প্রতুল না,— ?

চিঠিখানা ঊষার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে চলে এলাম রাস্তায়।

রাস্তার কোলাহল, জটিলতা আমার চোখের সাম্‌নে ভারি বিস্বাদ ঠেকে। কি জানি কেন—! প্রতুল যদি ঊষাকে ভালবেসেই থাকে, আমার তা'তে আপত্তি করবার কি আছে?

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পথে-পথে ঘুরে বেড়াই।

দিন তিনেক পরে, সন্ধ্যার মুখে হঠাৎ একদিন প্রতুল এসে হাজির। সে যে মোটরে চড়ে এসেছে, তা' বাইরে হর্ণের শব্দ শুনেই বুঝতে পারা গেল। প্রতুল কলেজে আসত মোটর করেই।

রামবাবু বাড়ী ছিলেন না। রাধু বসেছিলেন সন্ধ্যে করতে। সুতরাং প্রতুল সোজা উষার সঙ্গেই কথা কইতে সুরু করে দিল। পাশের ঘর থেকে শুনতে পেলাম।—

—চিঠির জবাব দাওনি কেন? প্রতুল জিজ্ঞাসা করে।

কিন্তু ওপক্ষ থেকে কোন জবাবই নেই। কল্পনা করলুম, উষার মুখখানি অকারণ লজ্জা ও সঙ্কোচে রাঙা হ'য়ে উঠেচে। আঁচলের একটা প্রান্ত হয়ত আঙুলে জড়াচ্ছে।

আবার প্রতুলের কণ্ঠস্বর শোনা যায়,—কথা কইচ না কেন ? চিঠি দিলে অনেকখানি সময়ের অপব্যয় হ'ত, নয়— ?

অনতিপরিস্ফুট কণ্ঠে উষা বললে,—চিঠিতে কি লিখব আমি ঠিক করতে পারলুম না।

উত্তর শুনে প্রতুল যে সুখী হ'ল না, তা' অনায়াসেই অনুমান করতে পারলাম।

খানিকক্ষণ অস্বস্তিকর একটা স্তব্ধতা।

মনে হ'ল, প্রতুল চঞ্চল হ'য়ে মেঝের ওপর জুতোসমেত তার পা দুটো ঘসছে। উষা তখন কি করচে ?—বুঝিবা বিস্মিতের মতো প্রতুলের মুখের দিকে চেয়ে আছে, কিম্বা……

প্রতুল বলচে শুনতে পেলাম,—চিঠি না লিখলে আমি আর তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারব না।

—কেন পারবে না ? আমি কি করলুম ?—উষা বলে।

নাটকীয় সুরে প্রতুল বললে,—কি করেচ, তা' বোঝবার ক্ষমতা থাকলে আমাকে এমনি ক'রে নীচু হ'তে হ'ত না। সত্যি, তোমার জন্যে আমি কি যে করিনি উষা—তা' তুমি জান না।

উষা একটু চুপ ক'রে থেকে বললে,—তোমার কথা রাখতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নেই প্রতুল দা'। তুমি নিজেই ত' বললে যে, আমাদের জন্যে অনেক ক্ষতি স্বীকার করেচ। না হয়, আর একটা ক্ষতিও সহ্য করলে। দোহাই তোমার, তুমি আর এ বাড়ীতে এসো না, আমার সামনে এসো না। তুমি চলে যাও… ..

মনে হ'ল, উষা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদচে। আশ্চর্য্য! তা' হ'লে সে এতক্ষণ চুপ করেছিল কেন! কথাগুলি কেমন চমৎকার সাজিয়ে উষা বললে! তবে এতক্ষণ সে নির্দ্দোষ হ'বার চেষ্টা করছিল কেন? কি কথা প্রতুল উষাকে লিখেচে, যা রাখতে না পারার ক্ষোভে উষার এই কান্না! প্রেম-নিবেদন? কিন্তু তা'র মধ্যে ত' এতখানি ভয় এবং গোপনতার ভাব থাক্‌বার কথা নয়। কি জানি কি......

খানিক পরে প্রতুল গট্‌গট্‌ ক'রে মোটরে গিয়ে উঠল।—উষা ছাড়াও যে বাড়ীতে লোক আছে, সে কথা ও যেন জানেই না। লক্ষ্য করলুম, উষা আর ঘর থেকে বার হ'ল না। হয়ত মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদচে, কিম্বা অন্ধকার ঘরখানার ভেতর ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে!

'জপ' সেরে উঠেই রাধু ঠাকরুণ উষার কাছে এসে বললেন,—ও ছোঁড়া কে রে? উষার জবাব শুনতে পাওয়া গেল,—প্রতুল দা।

রাধু ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন,—প্রতুল দা!—কে সে? কোন কালে ত' তার নাম শুনিনি। বলি হ্যাঁলা, হায়া ঘেন্না কি এক রত্তি থাক্‌তে নেই? আমরা আছি না মরেচি!

উষা শঙ্কিত-কণ্ঠে শুধোলে,—কেন, কি করলুম পিসি-মা?

পিসিমা উত্তরে বল্‌লেন,—যা' করেচ, বেশ ক'রেচ মা, আমি আর বলে নিমিত্তের ভাগী হই কেন? আসুক রাম, তাকেই সব কথা বলব'খন।

খানিক পরে রামবাবু বাড়ী ফিরলে উষাকে কেন্দ্র ক'রে রাধু ঠাকরুণ যে কাণ্ডটা করলেন, তা' যে কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতেই বে-মানান। আমি ত' পাশের ঘর থেকে উষা ও প্রতুলের আলাপের অনেক কথাই শুনেছিলুম; ইচ্ছা করলে আমি উষাকে গিয়ে রক্ষা করতে পারতুম; কিন্তু কি জানি কেন একটা কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলুম না। বোধ করি, আমার অগোচর-মন একটা সস্তা প্রতিশোধ নেবার জন্যে তৈরী হয়েছিল।

একটু পরেই উষা একেবারে আমার ঘরে এসে ঢুকল। চোখ দুটি কেঁদে কেঁদে সে ফুলিয়েচে; রুক্ষ চুলগুলি ছোট কপালের ওপর, শুকনো মুখের ওপর এসে পড়েচে। ঘরে ঢুকেই বললো,- -তুমি ত' বাড়ীতে ছিলে অজয় দা, তোমার মা ছিলেন, সেবা ছিল……বলনা আমি কি করেচি?

নিঃশব্দেই ভেবে দেখলাম যে, উষার যদি কোন দোষ থাকে, তবে দোষ তার সদ্য মুকুলিত দেহের; তার নব-সুগন্ধ যৌবনের। কিন্তু প্রতুলের দোষ তার চেয়ে ঢের বেশী। সে চায় তা'কে নিয়ে খেলা করতে, ফুলের দলগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেখতে…

উষাকে বললাম,—ঐ সব বিষয়ে আমার কোন কথাই বলবার নেই উষা। তোমার বাবার উপর এর বিচারের ভার ছেড়ে দেওয়াই সব দিক দিয়ে মঙ্গল।

—কোন কথাই তুমি বলবে না? আহতকণ্ঠে উষা বললো।

—না। কোন কথাই বলবো না।

ঊষা মিনিট কতক নীরব নির্ব্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল শুধু। বেশ বুঝতে পারলুম যে, অত বড় একটা কথা সে আমার কাছে প্রত্যাশা করেনি। চোখ দুটী তার হয়ত মুহূর্ত্তের জন্যে ছলছল করে উঠেছিল...কিম্বা আমারই মনের একটা মোহই কেবল, মিথ্যা মায়া।

ঊষা ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর মনের মধ্যে এই ভেবে ভারি দুঃখ হ'ল যে, কেন তার হয়ে একটী সহানুভূতির কথা বললুম না। ভিক্ষার্থিনী হ'য়ে সে এসেছিল, এসেছিল আমার কাছে—স্বল্প একটু সান্ত্বনার প্রত্যাশায়। আমি তার সম্বন্ধে হঠাৎ অমন কঠিন হয়ে উঠলাম কি করে ?

ঊষার সঙ্গে পরদিন সকালে যখন দেখা হ'ল, তখন তার কঠিন মুখের দিকে চেয়ে ভয় পেলাম। তার চোখ দুটোতে একটা অস্বাভাবিক আলো দেখা দিয়েচে—সমস্ত রাত্রি বোধ করি ঘুমোয়নি। বোধ হয় অন্ধকার, শেষহীন আকাশের দিকে চেয়ে অনেক কিছুই ভেবেছে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় এমন ভাবে পাশ কাটিয়ে গেল, যেন আমাকে চেনেই না।

তারপর হঠাৎ একদিন সাকীর কাছ থেকে একখানা চিঠি এসে হাজির।

সত্যি, সাকীর কথা এতদিন আমার একেবারেই মনে ছিল না। বহুদিন পরে তার চিঠিখানি পেয়ে ভারি যেন সুখী বোধ করতে লাগলাম। তবু, কিছুক্ষণ অন্য কথা ভাবতে পারব। সাকী লিখেচে, এই ক'মাসের মধ্যে আমি তাকে একখানি চিঠিও দিইনি কেন? কেন দিইনি, অবিশ্যি তার কোন জবাব নেই। তারপর সে লিখেচে যে, অশান্তকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে পুলিশের এত বেশী আগ্রহ হওয়ার কারণ, আকবর আলি চৌধুরীর শুভেচ্ছা। অশান্ত গরীব দুঃখীদের জন্যে খাটে, তার

চাল নেই, চুলো নেই—এই ত' তার বিপক্ষে যথেষ্ট অভিযোগ। তা' ছাড়া সে কি না চায়, অত বড় জমিদারের ছেলের বাড়া ভাতে ছাই দিতে! উপরন্তু সাকীর নিজের অবস্থাও খুব নিরাপদ নয়। গ্রাম থেকে মেয়ে চুরি ত' প্রায়ই হয়। আজ এখানে, কাল সেখানে। এক্ষেত্রে রসুলপুর ছেড়ে অপর কোথাও পালাতে পারলে সে বাঁচে। নিজের বিষয় সম্পত্তিও সে বেশীর ভাগ বেচে ফেলে, টাকা ক'রে নিয়েছে। তা'কে নিয়ে অজয়ের কোন বিপদে পড়বার সম্ভাবনা নেই। কেবল সে যদি একটু অনুগ্রহ করে একবার রসুলপুরে গিয়ে তাকে কলকাতায় নিয়ে যায়...... কলকাতায় এসে ও স্বদেশী জিনিষের একটা দোকান খুলবে, কিম্বা সেবাশ্রম।

চিঠি পড়ে যাবার ইচ্ছেটা আর দমন করতে পারলুম না। সত্যি, অশান্ত ফিরে না আসা পর্য্যন্ত মেয়েটির ভাল-মন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখা আমার কর্ত্তব্য। তা' ছাড়া কলকাতার বাড়ীর এই বিশ্রী, অস্বস্তিকর অবস্থা থেকেও কিছুদিনের জন্যে মুক্তি পাওয়া যাবে।

সুতরাং সেইদিন, হ্যাঁ, ঠিক সেইদিন রাত্রিতেই চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা হলুম।

পথের আকাশে সে রাত্রে চাঁদের সন্ধান পাওয়া গেল না। মেঘে-মেঘে সমস্ত আকাশখানি আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। ট্রেণের জানালা দিয়ে হু-হু ক'রে ঠাণ্ডা হাওয়া আসচে, নিকটেই হয়ত' কোথাও বৃষ্টি আরম্ভ হয়েচে। সারারাত্রি আমার ঘুম এলো না।

এলো মেলো কত কথাই না ভাবলুম। ভাবলুম, জীবনটাকে অশান্তর মতো দেশের পায়ে উৎসর্গ করতে চলেচি, কিন্তু অশান্তর মতো অমন সবল বাহু, অমন কঠিন বুক, আমি পাব কোথায়? এখনও কা'রও অভিমান-আহত চোখের দিকে চাইলে আমার মাথা নীচু হয়ে আসে, কারও অনুরোধ না রাখতে পারলে লজ্জা বোধ করি। অশান্তর মতো অমন অনায়াসে সমস্ত বন্ধন, সমস্ত মায়াকে অবহেলা কবার শক্তি যে আমার নেই! এই দুর্যোগেও অশান্ত হয়ত' কোন কুলী-মজুরের নোংরা বস্তীতে কোন বিকলাঙ্গ রোগীর মাথার শিয়রে বসে আছে, হয়ত' ক্রোশের পর ক্রোশ হেঁটে চলেচে কোন ধনীর দয়া ভিক্ষা করতে...হয়ত এক সপ্তাহ সে ভাতের মুখ দেখতে পায়নি। আমি অতদূর পারি না, নিশ্চয় পারি না। আমি উত্তেজনার কথা শুনে অত্যন্ত সহজে উল্লসিত হ'য়ে উঠতে পারি; কিন্তু কোন কঠিন কাজের ভার যদি ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তা' হ'লে ভুল করতে আমার দেরী হবে না। আমার আপনার সঙ্গে যেন অত্যন্ত সহজে পরিচয় হয়ে গেল, সেই জন্যেই যেন নিজের ওপর একেবারে সমস্ত শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেললাম।

দিন চারেক পরে সাকীকে নিয়ে ফিরলাম।

ছোটখাট একটা হোটেলে ওর বাসের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে যখন বাড়ীতে আসলুম, তখন রাত্রি এগারটা এবং প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। যেদিন কলকাতা ছেড়েচি, বৃষ্টি নেমেচে সেই দিন এবং তখনও পর্য্যন্ত থামেনি। পথ-ঘাট সব জলে ভাসচে।

বাড়ীটা নিঝুম, বাইরে থেকে তাকিয়েই যেন কেমন ভয় হ'ল। কিন্তু বিস্ময়ের যে অনেকখানিই তখনও বাকী, সে কথা ভিতরে ঢুকবার আগে কল্পনা করবার সাধ্যিও আমার ছিল না।

উষা আর সে বাড়ীতে নেই। শুধু ঐ বাড়ীতে নেই বললেই যথেষ্ট হয় না, সে বাড়ীতে সম্ভবতঃ তাকে আর ফিরতে কোন দিন হবে না। আমার চট্টগ্রাম যাবার পরের রাত্রেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই সে কখন প্রতুলের সঙ্গে চলে গেছে। রাধু ত' প্রথমতঃ আমাকেই দোষী করবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছিলেন, কিন্তু পরে উষার বাক্স থেকে একখানা চিঠি পাওয়ায় সে সন্দেহ তাঁর দূর হয়েছে।

চিঠিখানি দেখলুম।

উষা লিখেচে,—'আমি কি দোষ করেছি জানি না। কিন্তু সেই দোষেরই জন্যে বাবা আমার সঙ্গে কথা বলেননি। সেবাও আমার সঙ্গে আর খেলা করতে আসেনি। অজয় দা আমার হ'য়ে একটা কথা বলা দরকার মনে করেননি।

আমি প্রতুলদা'কে চিঠি লিখেছি, আজ রাত্রেই আমায় ওদের বাড়ী নিয়ে যেতে। প্রতুল দা' নিশ্চয়ই আমায় নিয়ে যাবে।

সেদিন ত' সে চিঠিতেই লিখেছিল, আমায় নিয়ে কাশী বেড়াতে যাবে। কিন্তু কাশীতে আমি যাব না, সে অনেক দূর, সেখান থেকে বাবার জন্যে আমার কষ্ট হ'তে পারে। তাই আমি প্রতুলদা'র বাড়ীতেই চললুম, কেউ যেন আমার খোঁজ করতে আর না যায়।'

উষার চিঠি পড়ে বুঝতে পারলুম, প্রতুলের কি অনুরোধ সে দিন সে রাখতে পারবো না বলেছিল।

ছোট, নীচ প্রতুল !

প্রতুল উষার চিঠি পেয়ে সেই রাত্রেই গাড়ী নিয়ে এসেছিল। তবে নিজের বাড়ীতে উষাকে সে নিয়ে যায়নি, নিয়ে গেছে আর কোথাও। হয়ত' কাশীতেই, কিম্বা কলকাতার কোন কু-খ্যাত পল্লীতে। রামবাবু আজও প্রতুলের বাড়ী গিছলেন, কিন্তু সে ফেরেনি।

উষার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে চোখে জল এল।

চালাক প্রতুল !

ধর্ম্মঘট ক'রে কলের কুলীরা নৈহাটি ছাড়িয়েও মাইল দুয়েক দূরে গঙ্গার ধারে যেখানে এসে আস্তানা গেড়েচে, সেখানে গিয়ে অশান্ত তার সঙ্গে দেখা করতে লিখেছে। চিঠি যখন পেলাম তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে, অথচ অশান্ত দুটোর মধ্যে পৌঁছতে লিখেছে। সাকিনাকে যে খবর দেব সে সময়ও ছিল না।

সাড়ে এগারটার ট্রেণ ধরে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে বোধ হয় তিনটে উতরে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে দেখি, পিছনে সুদূর প্রসারিত মাঠ, সামনে দু-কূল ভরা গঙ্গা। গঙ্গার ধারে ছোট ছোট ধাওড়া—খড়ে-ছাওয়া। কোনটির বা টিনের চাল ; খান-কয়েকের উপর মাত্র চটের আবরণ। গঙ্গাতীরের অমন তরতরে বালি

এরি মধ্যে পচা ভ্যাপসা গন্ধে বিষিয়ে উঠেছে। আবহাওয়ার বিষ-বাষ্পে দম বন্ধ হয়ে আসে। তাদের দুঃখ ও অসহায়তায় সমবেদনা জানিয়ে দূরের আকাশও যেন সেখানে অনেকখানি নেমে এসেছে, কিন্তু এরা তার গাঢ় নীলিমার সজীবতাটুকু নিঃশেষে শোষণ ক'রে পাংশু পাঁশুটে ক'রে তুলেচে।

একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি, অস্থি-সর্ব্বস্ব রোগা লিকলিকে একটি শিশু অল্প কয়েক বিন্দু দুধের জন্যে মায়ের বুকের উপর আছাড়ি-পিছাড়ি ক'রচে; আর বারে বারে ব্যর্থ হ'য়ে শুধু ক্ষুধায়, অভিমানে মায়ের শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আর যে হতভাগিনী নারী মাতৃত্বের মোহময় নেশায় তাকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছে, সে একান্তমনে কামনা করচে—কবে, কবে এই হতভাগা যে অন্ধকার থেকে এসেছিল সেই অন্ধকারে ফিরে যাবে! তার দুটি আঁখিতে অবিরল ধারা!

আমাকে দেখবামাত্র সেই মেয়েটির হিংস্র চোখদুটি যেন শিকারী বিড়ালের মতো ধ্বক্ ধ্বক্ ক'রে জ্বলে উঠল।—কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখার ধৈর্য্য ও সাহস আমার ছিল না।

শিশু মায়ের বুকে দুধ পাচ্ছে না, নারী লজ্জা ভুলেচে—মাতৃত্বকে ক্ষুধার জ্বালায় প্রলোভনের হাটে বিকিয়ে দিয়েচে, এর চেয়ে করুণ দৃশ্য কল্পনা করাও অসম্ভব! দু'পা এগিয়েই দেখি, একটা আগুনের কুণ্ডের চারি পাশে কতকগুলো শীর্ণ রুক্ষ ছেলে-মেয়ে, এমন কি তাদের বাপ-মাও পচা আলু-পোড়া নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। এমনি তাদের দেহের অবস্থা যে, অন্ধকার

রাত্রে তারা যদি কখন নির্জ্জন জায়গায় পথ আগলে দাঁড়ায়, মানুষ বলে চেনা দুঃসাধ্য। মানুষের কাঠামটুকুই আছে, আর সবই গেছে ক্ষুধার চিতায়!

মনে হ'ল, এই বুভুক্ষু নরনারী, যারা দিনের পর দিন উদয়াস্ত শরীরের রক্ত জল ক'রে ধনীর তোষাগার পূর্ণ করছে—তাদের সে প্রাণান্ত পরিশ্রমের এই পুরস্কার! অদ্ভুত!! অত্যাচারে মানুষ ভগবানকে ছাড়িয়েও অনেক এগিয়ে গেছে।

লজ্জার কিছু ছিল না, তবুও সেখানে অশান্তর সন্ধান করতে কেমন একটু সঙ্কোচ হ'তে লাগল। পায়-পায় এগুতে লাগলাম। কিছুদূর গিয়েই দেখলাম, একটা কদাকার পুরুষ অর্দ্ধ উলঙ্গিনী একটি মেয়ের চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে অশ্রাব্য অকথা-কুকথায় গাল দিচ্ছে—আর মেয়েটির সে কী গগনভেদী বিকট চীৎকার! অনেকগুলো মেয়ে-পুরুষ চারিপাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে তাই দেখচে, হাততালি দিচ্ছে। তাদের হাসির সে কী হর্‌রা!

অনেকদিন আগেকার অশান্তর একটা কথা মনে পড়ল। অশান্ত বলেছিল, যাদের মনুষ্যত্বকে ভিত ক'রে আমরা প্রাসাদ গড়েচি, সেদিকে যদি কোন দিন নজর পড়ে, তোর চোখে জল ধরবে না।

ওদের মৃত্যু-মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে, ওদের অকারণ মৃত্যু দেখে আমার চোখে জল এল না,—চোখ দুটো অসহ্য যন্ত্রণায় টাটিয়ে উঠল।

একটু দূরেই একখানা টিন-ছাওয়া ঘরের দরজায় কুড়ি-বাইশ বছরের একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। দূর থেকে দেখলে সুশ্রী বলেই মনে হয়। যৌবন দেহের কাণায় কাণায় ভরা। শতছিন্ন মলিন বেশভূষা সত্ত্বেও ওর দাঁড়াবার ভঙ্গীটুকু দেখে মনে হয়, চারিপাশের আবহাওয়ার মাঝে ও যেন নেহাৎ খাপছাড়া।

ওর দিকে তাকাতেই হাত-ইসারায় আমায় ডাকলে। পল্লীটা খারাপ, অধিবাসীরা মানুষদেহধারী অর্দ্ধ পশু। কিন্তু দিনের উজ্জ্বল আলোকেও নারী যে অতখানি লজ্জাহীনা হ'তে পারে সে কথা কোনদিনই আমি কল্পনা ক'রতে পারিনি। সারা দেহ বিতৃষ্ণায় সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠল।

অশান্ত যদি ওদেরই সাহায্যে বন্দিনী ভারতবর্ষের বন্ধন-মোচনের স্বপ্ন দেখে থাকে, তা'র হৃদয়ের প্রসারতার তারিফ করা চলে, কিন্তু পাঁকের সেই গভীর পঙ্কিলতা থেকে ওদের উদ্ধার কোরে মানুষ করা এবং অধিকারের দাবী বুঝিয়ে কাজে লাগাবার আশা যদি সে নিজের আয়ু দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে থাকে, তা হ'লে বলতেই হবে, ওর আশার মৃত্যু,—না, অপমৃত্যু হোক, ও মানুষের জগতে ফিরে আসুক—

শেষ পর্য্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেয়েটির পুনঃ পুনঃ আগ্রহ আহ্বানকে উপেক্ষা ক'রতে পারিনি। এবং তার কাছ থেকে যে করুণ অথচ নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসেচি, নিজের অকারণ দাম্ভিকতায় ফিরে এলে আমার আপশোষের আর অন্ত থাকত না।

এগিয়ে যেতেই মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে—আপনি নিশ্চয়ই নান্নু মিঞাকে খুঁজচেন ?

ধীরে বল্লাম—না, অন্য একজনকে।

ও জিজ্ঞাসা করলে—কাকে ?

বল্লাম—সে এখানে থাকে না, মাঝে মাঝে আসে। দোহারা চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মুখে গোঁফ-দাড়িও আছে—ভদ্দর লোকের ছেলে।

গম্ভীরভাবে ও বল্লে—এখানে ভদ্দর লোক কেউ থাকে না, সবাই কুলি-মজুর। আপনি বোধ হয় পথ ভুল করেচেন। আর একটু এগিয়ে গেলেই মাঠের পারে গাঁয়ের পথ, সেখানে কাউকে আপনার বর্ণনা দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে খোঁজ পেতে পারেন।

বল্লাম—না, না,—সে আমায় এইখানেই আসতে লিখেছিল।

মৃদু হেসে মেয়েটি বল্লে—আসতে লিখেছিল, এসেও হাজির, অথচ তার নাম জানেন না—এমন আশ্চর্য্যের কথাও তো কখনও শুনি নি।

বল্লাম—তার নাম অশান্ত।

মেয়েটি আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লে—তোবা, তোবা,—অশান্ত নামে একটি ভদ্রলোক ত' অনেক দিন আগেই কল্মা পড়ে নান্নু মিঞা হ'য়েচেন—

—নান্নু মিঞা !!

হাসতে হাসতে মেয়েটি বল্লে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ভিতরে আসুন না, সব বল্‌চি।

আমার বুঝতে একটুও দেরী হ'ল না যে, পুলিশের দৃষ্টি থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখবার জন্যেই অশান্ত এই নাহু মিঞার ছদ্মবেশ পরেচে। কিন্তু নিঃসঙ্কোচে মেয়েটির ঘরে ঢুকতে পাচ্ছি না দেখে ও বল্‌লে—ভয় নেই, আপনি যা ভাবচেন আমি তা' নই, আমার স্বামী আছেন—

দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই জন চারেক লোক ঘরের পাশ দিয়ে হাসতে হাসতে চ'লে গেল, এমনি ভাব যে কিছুই তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

মিনিট দুই নীরবে কাটবার পর মেয়েটি বল্‌লে—বিশেষ কোন জরুরী কাজের জন্যে অশান্ত বাবু আপনার জন্যে অপেক্ষা করতে পারেন নি—চলে গেছেন। আপনাকে এই খবরটুকু দেবার জন্যেই আমি দাঁড়িয়েছিলাম—

আমি কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই ও আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলে—আচ্ছা, অশান্ত বাবু এই যে সকলকে বলে বেড়াচ্চেন স্বরাজ পাবার আর দেরী নেই, কথাটা কি সত্যি, না মানুষকে শুধু শুধু খানিকটা ক্ষ্যাপানো? যারা খেতে পাচ্ছে না, তাদের কথা ছেড়ে দিন, কিন্তু যারা কোনও মতে দুমুঠো যোগাড় করচে, তাদের বেশীর লোভ দেখিয়ে এমনিভাবে টেনে আনা—এটা কি ভাল হচ্ছে?

কুলী-ধাওড়ার একটা মিস্ত্রির বৌর সঙ্গে যে কথা বল্‌ছিলাম সে কথা আমার মনেই ছিল না। বল্‌লাম—অশান্ত মিথ্যা কথা বলে না। কালই স্বরাজ না পেলেও জবরদস্তওয়ালাদের যে এতে বেশ একটু কাহিল করা যাবে, এটা ঠিক—

মেয়েটির ভীরু আঁখি দুটী আশার উজ্জ্বল আলোয় কূলে কূলে ভ'রে উঠে তখনই তার উপর যেন গোধূলির ছায়া নেমে এল।

বল্লে,—শুধু এই!

'এই' কথাটী উচ্চারণ করার ভঙ্গীতে বিস্মিত হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে জোর দিয়ে বললাম,—সবটুকু যার পরের হাতে এবং ক্ষমতায় যে অসুর, তার কাছ থেকে এর বেশী আদায় ক'রে নেবার দিনও ত' আমাদের আজও আসেনি।

কথায় কথায় অনেক দেরী হ'য়ে গেছে, আবার দুমাইল পথ হেঁটে ট্রেন ধরতে হবে। সন্ধ্যারও বেশী দেরী ছিল না।

উঠতে যাচ্ছি—

বললে,—মানুষের যেমন দেবতা হওয়ার আশা করা অন্যায়, তেমনি অকারণে মানুষকে সন্দেহ করা হীনতা—এ কথা কি আপনি স্বীকার করেন?

কোন উত্তর দেবার আগেই ও আবার বল্‌তে সুরু কর্‌লে,—আপনার কি বিশ্বাস হয় যে, এই আবহাওয়ার মধ্যেই আমার এত-খানি বয়েস কেটেচে, বাহিরের বড় পৃথিবীর সঙ্গে কোনদিনই আমার সম্বন্ধ ছিল না?

উত্তরে কিছু বলবার ছিল না।

ও-ই মৃদু হেসে বললে,—বলুন না, সঙ্কোচ কিসের?

মেয়েটির পাণ্ডুর ঠোঁটের কিনারে ঐ ধারালো হাসিটুকু যেমনি অশোভন তেমনি করুণ! ও যখন উত্তর চায়, তখন বাধ্য হ'য়েই বল্‌তে হ'ল,—কেমন ক'রে জান্‌ব বলুন।

বললে,—আপনারও যে দেবতা হওয়ার লোভ ষোল আনাই আছে! কিন্তু গৃহস্থের শিক্ষিত মেয়েকে অসহায় অবস্থায় পেয়ে, জোর ক'রে সংসারের বাইরে এনে—তার সর্ব্বনাশ ক'রে দেশ-সেবাই করুন আর বুকের রক্তে দেশের মাটী রাঙা ক'রে তুলুন—অভিশাপ আমি আপনাদের দেবই, দেবতা ব'লে কোন দিনই পূজো ক'রতে পার্‌ব না—

উত্তর দেবার চেষ্টা না ক'রে বললাম,—অশান্ত এলে বল্‌বেন আমি এসেছিলুম।

একটু বিরক্ত হ'য়ে মেয়েটি বল্‌লে,—সে ত' ব'ল্‌বই, তার জন্যেই ত' দাঁড়িয়েও আছি। কিন্তু আমার কথার ত' জবাব দিলেন না? মানুষকে খামকা ক্ষেপিয়ে লাভ কি?

দিনের আকাশে অন্ধকারের ছায়া এসে পড়েছে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠল ব'লে; কিন্তু তবুও যেন মেয়েটির সঙ্গে আরও দু'দণ্ড কথা কইবার লোভ সম্বরণ ক'র্‌তে পারলুম না। বললাম,··এ বিষয়ে জ্ঞান আমার এত অল্প যে তা'তে কারও অবিশ্বাসকে ধুয়ে দিতে পারব না; আপনি অশান্তকে জিজ্ঞাসা ক'রবেন, সে নিশ্চয়ই এর জবাব দেবে।

—না, অশান্ত বাবুকে আমি অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি কোন উত্তর দেন না, কেবলি হাসেন। যদি বা কখনও মুখ ফুটে কিছু বলেন—তাঁর মুখে শুধু এক কথা,—যে মন্দির থেকে দেবতা বিদায় নিয়ে গেছে, সে ইটের ঘরকে মন্দির ব'লে মাথা খুঁড়ে কোন লাভ নেই চপলা, কেবল আত্ম-বঞ্চনা।

পরিচয়ের সুর থেকেই মেয়েটির কথাবার্ত্তায়, হাব-ভাবে এমন একটা বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হ'য়ে উঠছিল যে, তাকে অবহেলা ক'রে চলে আসা মোটেই সম্ভব নয়। আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—আপনাকে দেখে প্রথম থেকেই মনে হ'য়েচে—আপনাকে এখানে মানায় না, পথ ভুলে এসেছেন। আমার এ ধারণা সত্য হ'লে ব্যথা হয়ত' একটু পাব, কিন্তু অশান্তর উপর আমার শ্রদ্ধা আরও বাড়বে।

মেয়েটি মৃদু হেসে বললে,—আপনার শ্রদ্ধা যথাস্থানে পৌঁছে দেব। কিন্তু পথ ভুলে আমি আসিনি,—আমাকে জোর ক'রে এই পাঁকে নিয়ে এসেচে।

ঠোঁট দু'খানিতে মৃদু হাসি লেগেই আছে। কিন্তু চোখের সজল ছায়ায় বিষাদময়ীর যে ছবি ফুটে উঠেছিল—তার দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল—একদিন উষার ভিতর আমি অশান্তর যে বন্দিনী ভারত-জননীর ছবি দেখেছিলাম, সে ছবির যতটুকু খুঁত ছিল তা' যেন সকল দিক দিয়ে এই তেজস্বিনী চপলার মধ্যে পূর্ণরূপ গ্রহণ করেছে। উষার করে কৃপাণ দিলে স্নেহ-মমতা এসে তার হাতকে অবশ অসাড় ক'রে দেবে, চপলা কিন্তু একটুও কেঁপে উঠবে না।

—কিন্তু প্রথমেই আমার উপর আপনার যে ধারণা হয়েছিল, সেটা ত' মোটেই গৌরবের নয়, অজয় বাবু!

—ও আমার সংস্কারান্ধ সঙ্কীর্ণ মনের ভ্রম। তা' ছাড়া পৃথিবীর বিষয়ে জ্ঞান আমার অত্যন্ত অল্প......

বিচিত্র ভঙ্গীতে সে শুধু বললে,—ও !

তারপর বললে,—কিন্তু জীবনে মানুষ কোন দিনই সংস্কারের মোহ কাটাতে পারে না। যাকে সে সংস্কার বলে জানে,—তাকে জোর ক'রে অতিক্রম ক'রতে গিয়ে অজ্ঞাতে সে অনেক সংস্কারকে পুষ্ট করে। সংস্কারের নেশা শুধু জন্মগত নয়—রক্তগত।

বস্তীবাসিনী কোন মেয়ের মুখে এই ধরণের কথা শুনতে পাব, এ আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। অবাক্ বিস্ময়ে ও-র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ম্লান হেসে ও বল্‌তে লাগল,—আমার নিজের কথা বল্‌বার মতো কিছু নয়। আজ যিনি আমার স্বামী, উনি হচ্ছেন একজন দাগী আসামী। বছর তিনেক আগে দু-বচ্ছর জেল খেটে যে দিন ও-র বন্ধু ছাড় পেলেন, তার সাতদিন পরেই জন-চারেক মিলে একদিন সন্ধ্যায় আমাদের গাঁয়ের পুকুর ঘাট থেকে আমাকে তুলে নিয়ে আসেন। তখন আমাদের কলেজ বন্ধ—বাবার সঙ্গে জীবনে সেই প্রথম নিজেদের দেশে গেছি। দেবী বলে পূজা করবার জন্যে আমাকে যে ওঁদের চণ্ডীমণ্ডপে নিয়ে গিয়ে তোলেননি, তা আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারচেন।

একটু নীরব থেকে বললে,—ফিরে যাবার পথ যেদিন পেলুম, সে দিন আমার জন্যে একটি দরজাও খোলা ছিল না। তবুও বন্ধ দোরে ধাক্কা দিতে কসুর করিনি, কিন্তু একটি দোরও খুল্‌ল না ! তা' ছাড়া আপনি শুনে অবাক্ হবেন যে, ইনি এককালে স্বদেশের একজন পাণ্ডা ছিলেন ! দেশের জন্যে টাকা লুট কর্‌তে কর্‌তে

একদিন বোধ হয় আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিলেন যে, সে টাকা নিজের জন্যে খরচ করলে অনেক লাভ, অনেক আনন্দ। সেই দিন থেকেই ইনি হ'য়েচেন ডাকাত। খবরের কাগজে আপনি নিশ্চয়ই এঁর নাম দেখেছেন। আগে লোকের মুখে এঁর দুঃসাহসের প্রশংসা ধরত না; কলেজে কতদিন আমি নিজেই তাঁর হ'য়ে সহপাঠিনীদের সঙ্গে তর্ক করেছি।

উপরের আকাশে দু'-একটি তারা উঠে থাকবে। সেই অন্ধকারের মধ্যে মুখোমুখি বসে একটি নারীর জীবনের করুণ কাহিনী শুন্‌ছি, সে কথা ভেবে নিজেকে এত বড় মনে হচ্ছিল তা' বল্‌বার নয়। এ কথা আমার অজানা ছিল না যে, মেয়েটির জীবনের বিগত বসন্ত দিনগুলিকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। সহানুভূতিতে সন্তুষ্ট হবার মেয়েও যে চপলা নয়, তাও ততক্ষণে বেশ বুঝেছি।

ও বল্‌তে লাগল,—আপনি হয়ত' বল্‌বেন, এছাড়াও ত' আরও অনেক পথ ছিল। ছিল, সে আমিও জানি। কোন একটা স্কুলের মাষ্টারি জুটতেও হয়ত' দেরী হ'ত না। কিন্তু কেন যে পারিনি, সে কথা আমি নিজেই বুঝতে পারিনে।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও-র মাথা নীচু হ'য়ে এল।

আমিও খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলাম।...

এম্‌নি ভাবে কয়েক মিনিট কাটাব পর সে যখন আমার দিকে তাকাল,—অন্ধকারেও যেন বেশ বুঝতে পারলুম যে, তার দু'টি চোখের তীরে অশ্রুর ঢল নেমেছে।

বললে,—পৃথিবীর সবগুলো পথই ত' আপনারা আগলে বসে আছেন। এঁর কাছ থেকে গিয়ে আমায় ত' আবার আপনারই আশ্রয় নিতে হ'ত ? নারীর যেদিন অন্যায়ের জন্যে পুরুষকে শাস্তি দেবার অধিকার আস্‌বে, সেই দিনই আমি এ আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে পার্‌ব, তার আগে নয়।

তখনই কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে,—আমার যদি কোন দিন ছেলে হয়, শ্রেষ্ঠ দেশ-প্রেমিকের রক্ত তার শরীরে থাক্‌বে, কি বলেন ?

কথা শেষ ক'রেই খিল-খিল ক'রে হেসে উঠল। তার চোখের কোণে তখনও হয়ত' অশ্রু টল্‌মল্ কর্‌ছে।

রাস্তায় বেরিয়ে পথ চলার সঙ্গে সঙ্গে ভেবেছি, বস্তিবাসিনী নারীর মুখে এ কথা হয়ত' অশোভন, কিন্তু চপলা ত' সেখানে বেশী নেই।

কল্‌কাতায় যখন পৌঁছলুম, রাত তখন অনেক হ'য়ে গেছে। হোটেলে গিয়ে দেখি, সাকিনা তখনও আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

বললে,—সকাল থেকে কেবলই ভাবছি, এই আপনি এলেন। সারাদিন কোথায় ছিলেন ?

ক্লান্তি ও অবসাদে সর্ব্বাঙ্গ ভারী হ'য়ে উঠেছে। কোন কথার উত্তর না দিয়েই তার বিছানায় শুয়ে পড়লুম। সাকিনার বিছানায় শোয়া যে অশোভন ও অন্যায়, তা' বিচার করার মতো অবস্থা মনের তখন ছিল না, দেহেরও ছিল না। সমস্ত পথ চপলা যেন আমার পিছু পিছু ব্যঙ্গ করতে করতে এসে, সাকিনার দরজা থেকে ফিরে গেছে। তার কথার ঝাঁঝাল সুর তখনও আমার কানের চারি পাশে ভেসে বেড়াচ্ছে !

বিছানার দিকে এগিয়ে এসে সাকিনা জিজ্ঞাসা করলে,—কি হ'ল আপনার ? মুখে কথা নেই, চুল উস্কো খুস্কো !—সারাদিন কোথায় ছিলেন ?......

বললাম,—তোমারই একটা হিল্লে করতে গিয়েছিলুম, কিন্তু সেখানে গিয়ে আমার যেটুকু ছিল, তা'ও খুইয়ে এসেছি।

মুখ গম্ভীর ক'রে সাকিনা বললে—হেঁয়ালী ক'রে কথা বলা আপনাদের অভ্যাস, না, এটা দেশ-সেবকদের একটা অঙ্গ ?—

—অঙ্গই হয় ত'।

সাকিনা মুখ ভার ক'রে দূরে সরে গিয়ে একখানা চেয়ারে বসল। আমিও সুযোগ পেয়ে একটু জিরিয়ে নেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না, চুপ ক'রে রইলাম। বেশ খানিকক্ষণ নীরবে কেটে গেল। তারপর ও-ই বললে,—রাত অনেক হ'ল, বাড়ী যেতে হবে, এ কথাটাও কি ভুলে গেছেন ?

—মোটেই ভুলিনি। আর ভুলিনি বলেই ত' আবার এতখানি পথ হাঁটবার মতো শক্তি সঞ্চয় করছি।

বললাম,—আজ সকালে অশান্তর একখানা চিঠি পেয়েছি—তার সঙ্গে দেখা করতে লিখেছিল। চিঠি পেয়ে হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে গেলুম, কিন্তু হতভাগার জরুরী কাজের ত' অন্ত নেই! গিয়ে শুন্‌লুম, আমার জন্যে অপেক্ষা করার মতো ফুরসৎ না থাকায় তিনি কি একটা কাজে বেরিয়ে গেছেন, এবং কবে যে ফির্‌বেন দয়া ক'রে সে কথাটাও বলে যাবার সময় পান্‌নি!

চিঠিখানা পকেট থেকে বার ক'রে বিছানার উপর রেখে বললাম,—পড়ে দেখ; কাল সকালে এসে দু'জনে পরামর্শ ক'রে যা' হ'ক্ একটা ঠিক কর্‌তেই হবে।—

সাকিনা ঠিক তেমনি ভাবেই চেয়ারে বসে রইল, একটী কথাও বললে না। দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে নজর পড়তেই দেখলাম, বারোটা বাজে। তার বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললুম,—এই ত' সবে যাত্রা সুরু, এরি মধ্যে মুষড়ে পড়লে ত' চল্‌বে না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে সাকিনা বল্‌লে,—আজ দুপুরে চৌধুরী সাহেব এখানে এসেছিলেন।

যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, ফের বিছানার উপর বসে জিজ্ঞাসা করলাম,—আকবর আলি?

সাকিনা বললে,—হাঁ। কিন্তু আপনি শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে, তিনি আমাকে ভালবাসা জানাতে আসেন নি, শুধু একবার দেখতে এসেছিলেন। আরো অনেক কথাই বলেছেন, কিন্তু সে সব থাক্—রাত অনেক হ'ল।

বাধা দিয়ে বললাম,—রাত শেষ হ'য়ে যাক্ না তা'তেও ক্ষতি নেই, কিন্তু সমস্ত শোনার বিশেষ দরকার—

—এত তাড়াতাড়ি কিসের? কাল সকালেই শুন্‌বেন। সেই সকালে ত' বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন, রাত বারোটা বাজল; এখনও ফিরতে না দেখে মা হয়ত' খুব ভাবছেন। আপনি বাড়ী যান।

—ভাবনা ত' মায়েদের আছেই। আমি যদি এখনই না ফিরে আর আধ ঘণ্টা পরে ফিরি, তা'তে তাঁর ভাবনার ভার সবিশেষ লঘু হবে, তাও ত' নয়। তুমি বলো, যদি কিছু করবার থাকে সারারাত ভেবে একটা উপায় হয়ত' ঠিক করতে পারব। চৌধুরী-সাহেবকে তুমি চেন না, এমন নয় সাকিনা!

সাকিনা বললে,—চৌধুরী সাহেব এখানে এসে আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী হ'য়ে ভিজিটিং কার্ডে আপনার নাম লিখে পাঠান। কার্ড দেখে আমি ত' অবাক্! দু'দিন যখন অজয়বাবু বিনা কার্ডে আমার সঙ্গে যখন তখন দেখা ক'রতে এসেছেন, আজ হঠাৎ এ খেয়াল কেন? মনে হ'ল, এ হয়ত' হোটেলের অনিবার্য্য 'এটিকেট'। কিন্তু অজয়ের নামের আড়ালে সহাস্য-বদন চৌধুরী সাহেব যখন আমার ঘরে এসে দাঁড়ালেন, আমি একেবারে হতভম্ব! কি যে বলব, আর কি যে বলা উচিত, কিছু ঠিক করতে না পেরে তাঁর দিকে যে কতক্ষণ স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলুম, বলতে পারিনে। তিনিই বললেন,—অন্যায় একটু হয়েছে সাকিনা, কিন্তু শুধু ঐটুকু। বিশ্বাস করো—তোমাকে শুধু

একবার দেখার জন্যে এসেছি, ভালবাসা জানাতে আসিনি। তারপর তিনি বললেন যে, আপনার রসুলপুর যাওয়া থেকে আমাদের চলে আসা, সব কিছুই তিনি জানেন। এবং এই হোটেলের ঠিকানা তাঁরই এক সাকরেদ আমাদের পিছু পিছু এসে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে গিয়েছিল।

এই পর্য্যন্ত শুনেই আমি বললুম,—হোটেলওয়ালারা ত' আচ্ছা উজবুক! অজয়কে তারা কি চেনে না, না দেখেনি?

—আপনিই ত' ভুলে যাচ্ছেন অজয়বাবু, হোটেলের খাতায় আপনি নাম লিখিয়েছেন—সবিতাদেবী ও অশোক রায়।

—তোমার নাম যে সবিতা, তাই বা কেমন ক'রে জান্‌লে?

—চাটগাঁ থেকে কলকাতা পর্য্যন্ত ধাওয়া যে ক'র্‌তে পারে, তার পক্ষে এ আর এমন কি কঠিন কাজ?

—খুব খানিকটা ন্যাকামী ক'রে গেল ত'?

—মোটেই নয়। আজ তাঁকে যতখানি সহৃদয়, মিষ্টভাষী ও মহৎ ভাবাপন্ন দেখলুম, অশান্তর সঙ্গে দেখা হবার আগে এঁর সঙ্গে আর একবার দেখা হ'লে—একটা কাফেরের জন্যে আমায় এমন ক'রে কূল ছেড়ে অকূলে ভাস্‌তে হাত না।

ঘড়িটায় টং ক'রে 'একটা' বাজল।

একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললুম,—অশান্ত তা' হ'লে ঠিক সময়েই হাজির হয়েছিল?

সাকিনা বললে,—ব্যাখ্যানা কাল সকালে এসে করবেন। ঘড়িতে 'একটা' বাজল শুনতে পেলেন?

বাজা একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেলেই ভাল হ'ত। কিন্তু ও যখন বাজবেই—বাজুক্। চৌধুরী সাহেব তোমায় আর কি বললেন, বল। আকবরের সঙ্গে তোমার আগেকার সম্বন্ধের কথা মনে পড়ে হয়ত' একটু দুর্ব্বলতা এসেছে ; কিন্তু সত্যিই তুমি জান না সাকিনা, আকবর আমাদের—বিশেষ ক'রে অশান্তর কত বড় শত্রু। ওঁর-ই জন্যে অশান্ত আজ কোনও জায়গায় দু'দিন তিষ্ঠুতে পারছে না! তোমাকে হারিয়ে যত দুঃখ না হ'ক্, তোমার উপেক্ষায় ও-র জিদ্ বেড়ে গেছে ; অশান্তর প্রতিষ্ঠায় ও হিংসায় জ্বলে মর্ছে। হ্যাঁ, অশান্তর বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি?

সাকিনা বললে,—অশান্ত বাবুর প্রশংসায় চৌধুরী সাহেব আজ একেবারে পঞ্চমুখ। অত প্রশংসা শুনে আমারই হিংসা হচ্ছিল! বল্লেন,—এঁরা মানুষ নন সাকিনা, দেবতা! দেশ ত' তোমার আমার সকলেরই, কিন্তু আমরা ক'জন এঁদের মতো দেশের জন্যে এমন ক'রে ভাবি?—প্রাণের মায়া পর্য্যন্ত নেই!

—তারপরই নিশ্চয় তিনি অশান্তর বর্ত্তমান ঠিকানা জান্তে চেয়েছেন, কি বলো?

ম্লান মুখে সাকিনা বল্লে,—কিন্তু আমি ত' অশান্ত বাবুর ঠিকানা জানিনে।

বিছানার উপর থেকে চিঠিখানা ফের তুলে নিয়ে পকেটে রেখে বল্লাম,—আজ অশান্তর একটা ফাঁড়া গেছে সাকিনা। ঠিকানা জান্লে তুমি নিশ্চয়ই চৌধুরী সাহেবের মুখে অশান্তর প্রশংসা শুনে তাঁকে ব'লে ফেলতে। চিঠিখানা নিয়ে যাচ্ছি।

তা' ব'লে তোমাকে অবিশ্বাস করছি মনে ক'র না। এখানা চুরি করবার লোকের হয়ত' এখানে অভাব নেই।

শঙ্কিত ভাবে আমার দিকে আর একটু এগিয়ে এসে সাকিনা জিজ্ঞাসা করলে,—অশান্তর সঙ্গে আমার কি একবারও দেখা আর হবে না?

—কেন হবে না, সাকিনা! দেশের জন্যে সে যদি হাজার বিপদকে তুচ্ছ করতে পারে, চৌধুরী সাহেবের ভয়ে সে তোমায় কিছুতেই ত্যাগ করবে না।

সাকিনা কোন কথা না ব'লে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু তাকে এত বড় আশ্বাস দিয়ে আমি নিজেই যেন লজ্জিত হ'য়ে পড়লুম। তবে সান্ত্বনা না দিয়েই বা কি ক'রে আমি সাকিনাকে বলতাম যে, যার জন্যে অশান্ত নিজের সর্ব্বস্বই ভাসিয়ে দিয়েছে—নারীর স্নেহ-নীড়ে বাসা বাঁধবার অবসর তার নেই। অবাধ দুরন্ত পাখী—সেও সন্ধ্যার ছায়ায় অসীম আকাশকে পিছনে ফেলে নীড়ে ফিরে আসে, কিন্তু অশান্ত একেবারে ছন্নছাড়া, উদ্দাম!

দেশের কাজের জন্যে অশান্ত আমায় তার দলে নিতে চেয়েছে, কিন্তু দেশকে আড়াল ক'রে তিনটী মেয়ে আমার অগ্রগতির পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে—-উষা, সাকিনা এবং চপলা।

দুটী স্থলপদ্ম, একটী পঙ্কজ!

উষার জন্যে বাড়ীতে বেশীক্ষণ থাকতে পারিনে, চারিপাশের বিষণ্ণ আবহাওয়ায় যেন দম বন্ধ হ'য়ে আসে। রামতারণের ক্লান্ত মুখখানি কেবলই চোখের উপর ভেসে ওঠে!

দিন কতক আগে রামতারণ বাবুরা বাড়ী ছেড়ে দিয়ে কাশী চলে গেছেন। ঘরগুলো একেবারে খালি। খালি তাঁরা আসবার আগেও ছিল। কিন্তু তবুও মনে হয়, তাঁরা চলে যাওয়ায়

সেগুলো শুধু খালি হয়নি, যেন সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কিছু হারিয়েছে! যাবার সময় রামতারণের সে কী কাতর অনুনয়—যেন কত বড় অপরাধ ক'রে তিনি ভয়ে ভয়ে পালাচ্ছেন।

বললেন,—আমারই ত' সব অপরাধ। আমি যদি নিজের বিবেককে সমাজের ভয়ে হত্যা না করতুম, তা' হ'লে ওদের এমনি ভাবে চলে যেতেই বা হবে কেন? যে কলঙ্ক তাদের ঘিরে রইল, তার জন্যেও আমি দায়ী। তারা যদি পরস্পরকে বুঝতে পেরে থাকে—তার চেয়ে বড়ো আনন্দের আমার আর কিছুই নেই। কিন্তু ভয় হয়, যদি ভুল বুঝে নিজেদের সর্ব্বনাশ করে।—তারা সুখে আছে এই খবরটুকু পাবার জন্যেই বেঁচে থাকবো।

ওদিকে রাধু ঠাকুরুণের আওয়াজ পাওয়া গেল, মাকে বলছেন,—এমন যে হবে তা' আমি জানতাম। তোমার ছেলেটী কিন্তু মা হীরের টুকরো!

মনে মনে হাসি এল—

রামতারণ বাবুর উত্তরে বললাম,—এতে কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই। এ বাড়ী থেকে আমার নিজের বোনেরও এমনিভাবে চলে যাওয়াও আশ্চর্য্য হ'ত না।

রামতারণ বললেন—উষা যে আমার অনুমতি না নিয়ে গেছে এর জন্যে আমার এতটুকু দুঃখ বা অভিমান নেই অজয়! বরং সত্যকে যে সে অস্বীকার করে নি, এর জন্যে নিজের অমার্জ্জনীয় অপরাধের মাঝেও অল্প একটু স্বস্তি পাই।

বাড়ীর চারিদিকেই উষার স্পর্শ মাখানো। মনে পড়ে, উষা কোনখানে দাঁড়াত, দোরের পাশ দিয়ে অতি সন্তর্পণে কেমন পা টিপে টিপে চল্‌ত। সেদিন আমারই ঘরে দাঁড়িয়ে সাশ্রুনেত্রে তার অপরাধ স্খালনের জন্মে দুটী সত্য কথা বল্‌তে অনুরোধ ক'রে ফিরে গেছে—

বাড়ী থেকে বেরিয়ে কোথায় যাব ভেবে পাইনে। রাস্তায় রাস্তায় উদ্দেশ্যহীন হ'য়ে ঘুরতেও ভাল লাগে না—

মুখে কিছু না বল্‌লেও সাকিনা যে দিন দিন বেশ অস্থির হ'য়ে পড়ছে, বুঝতে পারি; কিন্তু আর তাকে মিথ্যা স্তোকে ভুলিয়ে রাখতেও আমার ইচ্ছা হয় না। তাকে জানান দরকার যে অশান্ত কবে আসবে, কিংবা আর আসবে কি না, অশান্তই জানে।

চপলার তীব্র ব্যঙ্গ আমার চারিপাশে সদা সর্ব্বদা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী তীব্র তার ওই উচ্চারণের ভঙ্গীটুকু!..

রাত তখন বোধ হয় দুটো, কেবল একটু তন্দ্রা এসেচে, কে যেন বাইরে নাম ধ'রে ডাকলে। একটু আগে তন্দ্রার ঘোরে মনে হচ্ছিল, উষা বুঝি ফিরে এল। কিন্তু ঘুম ভাঙ্‌তেই যার ডাক কানে এল, সে উষা নয়—অশান্ত। যে উষা আমার দরজায় স্বপ্নে ধাক্কা দিচ্ছিল, তাকে আমি প্রথমে চিনতেই পারি নি। বিবর্ণ বিশীর্ণ দেহের লাবণ্যের শেষ-বিন্দুও কে যেন সমস্ত শুষে নিয়েচে! কিন্তু ও যখন ম্লান হেসে মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল, ওর চোখ দুটাকে চিনতে আমার একটুও দেরী হ'ল না।

বহুদিন আগে এক পাণ্ডু-চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় পাশের বাড়ীতে যখন সমারোহের অন্ত ছিল না—ফুল, আলো, অকারণ হাসি, উচ্ছলতা ; সেই উপরের আকাশের বুক থেকে নিজের শূন্য দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে যেভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিল, এ সেই দৃষ্টি !—ভীরু বন-মৃগীর মতো সন্ত্রস্ত দৃষ্টি !

কিন্তু ও আমার স্বপ্ন ! ঊষা আসেনি—বাইরে অশান্ত ডাকৃচে।

অপ্রত্যাশিত সময়ে অশান্তকে দেখে আমি একটুও আশ্চর্য্য হইনি—কেননা ও-র কাজে সময়ের চেয়ে যে সুযোগের দাম বেশী, তা' আমার জানা ছিল। অবাক্ হ'লাম অশান্তর চেহারা দেখে ! লক্ষ্মীর বর্ণিত একমুখ দাড়ি গোঁফের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। চপলার নাছ মিঞাও যে রাত দুটোর সময় আমার সঙ্গে মোলাকাৎ করতে এসেছে তাও মনে হ'ল না। পোষাক-পরিচ্ছদে বেশ পরিপাট্য। রুক্ষ ঝাঁকড়া চুলগুলো সযত্নে চিরুনী দিয়ে আঁচড়ান। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, ও বুঝি বিয়ে ক'রতে চলেচে !

দরজা খুলে বেরুতেই হাত ধরে বললে,—সাকিনাকে নিয়ে যাচ্ছি ; তোর সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছে, চল ঐ মোটরে বসে আছে।

অশান্ত কি অভিসন্ধি নিয়ে যে কি কাজ করে, সে কথা জানা শুধু শক্ত নয়—অসাধ্য।

ওর মুখের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি দেখে নিজের সারা মুখে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে হেসে বললে,—কিরে, প্রেমে পড়লি নাকি ?

হুঁ,—ব'লে গলির মোড়ে গিয়ে দেখি সত্যি সত্যি সাকিনা বসে আছে—মোটরে।

আমাকে দেখে নমস্কার ক'রে বললে,—ধন্যবাদ দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইনে; কিন্তু এ ক'দিন আমাকে নিয়ে আপনার যে ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়েছে, তা' উনি হয়ত' বুঝতেই পারবেন না, আমি কিন্তু ভুলব না।

অশান্ত বল্লে,—কৈ, কাঁদ সাকিনা! চোখের জল না ফেললে যে তোমাদের আত্মীয়তা জানানো হয় না।

সাকিনা বললে,—যার চোখের কোণে এক বিন্দু জল নেই, পরের অশ্রুর দাম সে কি বুঝবে?

আমি বল্লাম,—ভুল বললে সাকিনা, অশান্ত হয়ত আমাদের মতো সময় অসময় আত্মীয়তা জানানোর ছলে কাঁদে না; কিন্তু ও যখন কাঁদে, সে ও-র নিষ্ঠুরতার চেয়ে ভয়ঙ্কর—

পিঠ চাপড়ে অশান্ত বললে,—বক্তিমে ত' খুব শিখেছিস্ দেখছি—এ কার কেরামতি, সাকিনার না আর কারো?

লজ্জায় সাকিনা মুখ ফিরিয়ে নিল।

অশান্ত বললে,—বর্ত্তমানে বেশ কিছু টাকার দরকার আছে; অথচ কোনদিক দিয়েই টাকা আসার সম্ভাবনা নেই—তাই হঠাৎ সাকিনাকে মনে পড়ল। হ্যাঁ, আর একটা সুখবর শুনবি অজয়?—আমি আর কবিতা লিখিনে।

তারপর সাকিনার দিকে তাকিয়ে বললে,—কালই আমায় কিন্তু হাজার পাঁচেকের একখানা চেক্ দিতে হবে সাকিনা।

সাকিনা বললে,—ইস্, টাকা যেন ও-র জন্যেই আমি ব্যাঙ্কে জমা করেচি! দেব না ত'—এক পয়সাও দেব না।

অশান্ত হেসে বললে,—একবার বর্ণনা কর ত' অজয়, যেদিন ভোরে কাউকে কিছু না বলে রসুলপুর থেকে চলে এসেছিলুম, শ্রীমতীর তখনকার মুখের অবস্থা…

বাধা দিয়ে সাকিনা বললে,—ছাখো, বাজে বোক না কিন্তু, ও রকম করলে সব টাকা আমি অজয় বাবুকে দিয়ে দেব—

—তা' হ'লে অজয়কে আমি খুন ক'রব।

আমি বললাম,—তা' আর তোমার পক্ষে বিচিত্র কি?

আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে কাঁধের উপর হাত রেখে অশান্ত বললে,—না রে, তোকে গুলি করবার আগে আমিই আত্মহত্যা করব।

সাকিনার দিকে তাকিয়ে বললাম,—খুব গৌরবের কথাও ত' হ'ল না, কি বলো?

সাকিনা বললে,—জানি না।

আমি বললাম,—অশান্ত কেবল চায় টাকা এবং সে টাকা বাদ দিলে, ও-র কাছে তোমার বা আমার অবস্থা সমানই।

অশান্ত হাসতে হাসতে বললে,—ঠিক বলেছিস অজয়, সাকিনার টাকাগুলো যতদিন না হাতাতে পারচি, ততদিন ও-কে আমার কাছে রাখব; তারপর তোর কাছে পৌঁছে দেব।

অশান্তর পিঠে একটা ঘুসি মেরে বললাম,—রসিকতা রেখে এখন বল দেখি, শ্রীমানের দেখা আবার কোথায় পাওয়া যাবে?

মোটরে ষ্টার্ট দিয়ে সাকিনার দিকে তাকিয়ে অশান্ত জিজ্ঞাসা করলে,—পরশুই একটা দিন আছে, নেমন্তন্ন করে যাব ?

অপরূপ ভঙ্গীতে সাকিনা বললে,—জানিনে, যাও।

ষ্টিয়ারিংয়ে বসে অশান্ত বললে,—কবে দেখা হবে পরে জানাব।

কিন্তু পরদিনই শুনলুম, সাকিনারা যে হোটেলে ছিল, পুলিশ এসে ঘেরাও ক'রে খানা-তল্লাস করেছে।

দিন সাতেক পরেই অশান্তর কাছ থেকে ডাক এল। নিজের নাম-ছাপা কাগজে চিঠি লিখেছে, এবং লিখেছে 'গ্রেইট্-ইষ্টার্ণ' হোটেল থেকে। লিখেছে,—যেখানে আমি একদিনের জন্যে এমন কি একটা রাত বাস করেছি, পুলিশেরা সে সব জায়গাই ছেয়ে ফেলেছে। অনেক ভেবে দেখলাম নিজেকে নিরাপদ রাখতে হ'লে দিন কতক গা-ঢাকা দেওয়া দরকার। তাই এই বিলাসিতা। তা' ছাড়া জন-কয়েক বড় মক্কেল পাকড়াও করবারও আশা আছে। এইখানেই রাশিয়ার সেই ভদ্র লোকটির সঙ্গে দেখা হবে।......একবার এসে দেখে যা, সাকিনার দৌলতে কেমন নবাবী করছি, কিন্তু তোকে আসতে হবে আমার 'সরকার বাবু' ব'লে পরিচয় দিয়ে, বুঝেছিস্? সিট নম্বর বারোর 'মিঃ রায়ের' সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, কেউ কোন বাধা দেবে না। দু' এক দিনের মধ্যেই আসিস, বিশেষ দরকার।

চিঠি যখন পেলাম তখন সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে ! অশান্তর চিঠি, কতদিন পরে লিখেছে ! চিঠিখানা যেন বহুদূরের অশান্তকে আজ আমার নিকটে এনে দিয়েছে। নিজের ছোট ঘরের বাইরে যে এক ফালি আকাশ দেখা যায়, সেখানে যে কয়টি তারা ছিল সেইদিকে তাকিয়ে মনে হোল—আমরা কত অসহায় ! পায় পায় কত অসংখ্য বাধা ! এমনিভাবে আর কতদিন চলবে। ভাবলাম অশান্তকে এইবার ব'লব,—আর কেন অশান্ত ?

আরও অনেক কথাই ভাবলাম ওকে বলার মত।

দেখা হ'লে বললে,—যে আগুন আজ চারিদিকে ছড়িয়েছে সেটি ত' যাতে নিভে না যায়, তোকে সেই ভার নেবার জন্যেই আমি ডেকেছি। এ আগুন নিভবে না আমি জানি—কিন্তু গরীবের আশা এত ছোট, ও-দের আকাঙ্ক্ষা এত সীমাবদ্ধ যে, অল্প একটুখানির জন্যে প্রলোভনের ফাঁদে পা বাড়াতে ও-দের একটুও দেরী হয় না।

আমি বললাম,—কিন্তু তুমি ত' জান এ বিষয়ে আমার জ্ঞান কত অল্প।

অশান্ত ধমক দিয়ে বললে,—আমি যখন প্রথম এ পথে আসি, সঙ্গে কিছু জ্ঞানের বোঝা পিঠে ক'রে আনিনি। গরীবদের জন্যে মমতা, নিজের উপর বিশ্বাস এবং দেশের জন্যে সত্যিকার ভালবাসা যদি থাকে, অভিজ্ঞতা এ পথে পা বাড়ালেই হাত ধ'রে অভিনন্দন জানায়।

অস্বীকার করবার উপায় ছিল না। বিশেষতঃ এতদিন পরে একটা কাজ পেয়ে তবু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচব। বললুম,—কি ক'রতে হবে?

মৃদু হেসে অশান্ত বললে,—ধমক খেয়েই যে একেবারে ভাল ছেলে! বিশেষ কিছুই নয়—তোকে দিনকতক বেলেঘাটার আস্তানায় গিয়ে ও-দের সঙ্গে বাস ক'রতে হবে, আর সাকিনাও থাকবে তোরই জিম্মায়।

—সাকিনা?—আমি জিজ্ঞেস করলুম।

ও বললে,—তা' ছাড়া আর কোন উপায় দেখচিনে। সাকিনাকে কোথায় কার কাছে রাখি বল্?

—সাকিনাকে বলেছ?

—না, আর বললেই যে ও যেতে চাইবে তাও মনে হয় না। কিন্তু ও-কে যেতেই হবে; ও দিন দিন আমায় বড় দুর্ব্বল ক'রে তুলছে। এক ঘরে ও-র মতো মেয়ের সঙ্গে নিঃসঙ্গ ভাবে রাত্রি কাটান আমার পক্ষে অসম্ভব। অথচ প্রলোভনকে জয় করতে না পারলে, আমার সব আশা আকাঙ্ক্ষা যে একটা মেয়ের মুখের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাবে—ভাবতেও আমার ভয় করে।

—এ তোমার অন্যায় আশঙ্কা যে, মেয়েদের দিয়ে দেশের কোন কাজ হ'তে পারে না—তারা শুধু পথের কাঁটা।

অশান্ত বললে,—মেয়েদের দিয়ে দেশের কোন কাজ হ'ক বা না হ'ক—তারা যে পুরুষের অগ্রগতির প্রধান বাধা, এ অপ্রিয় সত্যকে তুমি কিছুতেই বদলাতে পারবে না।

এম্‌নি সময় পরদা ঠেলে সাকিনা ঘরে এল।

তার দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল, এতদিন যেন ভাদ্রের নদী কোথায় একটু বাধা পেয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়েছিল, আজ তার দু'কূল প্লাবিত হ'য়ে উঠেছে।

আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—হঠাৎ দেশ ছেড়ে-মেয়েদের নিয়ে আপনারা মেতে উঠলেন যে!

অশান্ত বললে,—সে এক ভারি মজার কথা সাকিনা, অজয় বলছিল,—তোমার মতো একটী মেয়েকে পেলে সে এসব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে দিব্যি সংসারী হ'য়ে যেতে পারে।

অত বড় মিথ্যা অপবাদের বিরুদ্ধে কিন্তু একটী কথাও অশান্ত আমায় বল্‌তে দিল না, চোখ-ইসারায় চুপ ক'রে থাকতে বলল।

লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে পড়ল, সাকিনার দিকে তাকাবার মতো সাহসও রইল না।

সাকিনা বললে,—ঘটক বিদায় নিয়ে বুঝি তর্ক হচ্ছিল?

অশান্ত বললে,—ঠিক তাই। অজয়কে আমি বলছিলুম, তুই যখন সাকিনার মতো মেয়ে চাস্, সাকিনাকেই নে; আমাকে তার টাকাগুলো দে। কিন্তু হতভাগা কিছুতেই রাজী হচ্ছে না।

আর বেশীক্ষণ ধৈর্য্য ধ'রে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠল। জোরে ধমক্ দিয়ে বলতে গেলাম,—অশান্ত, তোমার রসিকতা থামাও—ভদ্রতার গণ্ডী ডিঙিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কথা বল্‌তে গিয়ে নিজের কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই লজ্জায় নতমুখ হ'য়ে পড়লুম। অশান্ত ও সাকিনা দু'জনেই জোরে হেসে উঠল।

আমার অপ্রতিভ মুখের পানে তাকিয়ে অশান্ত তেমনি হাসতে হাসতে বললে,—লজ্জায় তোর মুখ লাল হ'য়ে উঠলেও, সাকিনার মতো মেয়ে একটি পেলে তুই যে সুখীই হতিস্,—এ কথা আমি হলফ ক'রে বলতে পারি অজয়! এই আমার অবস্থাটাই দেখ্‌না, কি ছিলুম, হয়েছি বা কী! যার ছেঁড়া খদ্দরে সেলাই করাই হ'ত না, তারি পরণে আজ চায়না সিল্কের সুট্! ফুটপাথে শুয়ে যখন রাত কাটিয়েচি, তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছিলুম, চৌরঙ্গীর এই 'গ্রেইট-ইষ্টার্ণ' হোটেলের ফটক কোনদিন অশান্ত পার হ'তে পারবে? ক'দিন ধরে স্প্রীংয়ের খাটে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মোটা হ'য়ে গেলুম! সাকিনার সঙ্গে আলাপ না হ'লে এ ক' রাত্তির হয়ত হাওড়া ষ্টেশনের বেঞ্চির উপরেই কেটে যেত। আর, সাকিনার কী সেবা-যত্ন! উপরি উপরি তিন দিন যাকে স্রেফ হাওয়া খেয়ে খুসী থাকতে হ'য়েচে, আজকাল দিনে চারবেলা না খেলে তাকে সাকিনার বকুনি খেতে হয়! আমাকে ও ভদ্রলোক না বানিয়ে ছাড়বে না। কবিরা নারীকে 'কল্যাণী' ব'লে কেন যে এত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, এতদিনে তা বুঝলুম। পুরুষের জীবনে সাকিনার প্রয়োজন আছে, এ কথা স্বীকার করি অজয়।

হঠাৎ দেখি অশান্তর হাসি থেমে গেছে; দুই চোখে ও-র গাঢ়তা!

বললুম,—তোমার মতো সন্ন্যেসীর মুখ থেকে এ অভিমত শুনলে, আশ্চর্য্য হবার কথাই বটে!

বাধা দিয়ে অশান্ত ব'লে উঠল,—তুই ভুল করেচিস অজয়, সন্ন্যেসী হবার সৎপ্রবৃত্তি থাকলে, বেলেঘাটা বা নৈহাটীর মজুর বস্তিতে না ঘুরে সটান করতুম কৈলাসযাত্রা। চাই কি একখানা জাঁদ্রেল গোছের ভ্রমণকাহিনীও লিখে ফেলতুম! নারী সম্বন্ধে আমার চেয়ে উঁচু ধারণা কারো নেই। কথা ও সুরের মতো নারী ও পুরুষের মধ্যে যে একটি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে, এ ধারণা আমার নভেল পড়ে হয়নি, হয়েচে নারীকে চেনবার সঙ্গে সঙ্গেই।

—তাই বুঝি জীবনে নারীকে প্রাণপণে এড়িয়ে চলছ? তোমাদের জয়-যাত্রার পাশে নারীকে একটুখানি স্থান দিতেও তোমরা নারাজ! নারীর প্রতি তোমাদের কী শ্রদ্ধা! অশান্ত, আমরা ঘৃণা সইতে পারি, অবহেলাও সইতে পারি, কিন্তু পারিনে মিথ্যাচারের অপমান সইতে। নারী সম্বন্ধে তোমার ওই মুখস্থ করা কথাগুলো আর ব'ল না, বুঝলে?

সাকিনার কণ্ঠে হঠাৎ সে কী কঠিন দৃপ্ততা! মুখে রক্তাভ উত্তেজনা! একটি অরুণ লেখার মতো ও-র ঋজু দেহটি থেকে আভা বিকীর্ণ হচ্ছে। অশান্তর মাথা হেঁট হ'য়ে এল। তারপর ধীরে ধীরে মাথা তুলে বললে,—হ্যাঁ, জীবনে আমি নারীকে এড়িয়ে চলিছি বটে, কিন্তু কেন জানো? আমাদের পথ আর তোমাদের পথ, এক নয়। আমাদের পথে নেমেচে রাত্রি, চলতে গেলে পায়ে ফুটবে কাঁটা; দোসর আমাদের মৃত্যু! সে-পথে কেমন ক'রে চলবে তোমরা? আমরা আকাশ—অন্ধকার, অকূল; আর তোমরা নীড়, গৃহদীপ; তোমরা নারী।

তলোয়ারের ফলার মতো ধারালো একটু হাসি সাকিনার মুখে খেলে গেল। বললে,—বাঃ, নারী সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা ত' তোমাদের! যে গৃহদীপ জ্বালে, সে কি মশাল ধ'রে পথে চলতে পারে না? নারীকে এতটা অপদার্থ ভাবো কেন? ভাবী পৃথিবী সৃষ্টি করবার গৌরব শুধু তোমাদেরই—এ অহঙ্কার মিথ্যে!

অশান্ত খানিকক্ষণ সাকিনার মুখের পানে নির্ণিমেষে তাকিয়ে রইল। দেখতে দেখতে ও-র মুখ কি এক অবরুদ্ধ বেদনায় বিবর্ণ হ'য়ে এল। দুই হাতে সহসা মুখখানা ঢেকে ব'লে উঠল,—অহঙ্কার নয় সাকী, এ আমার দুর্ভাগ্যের কথা! জীবনে তোমায় গ্রহণ করতে পারলুম না—এ শুধু তোমারই দুঃখ নয়, আমারও আত্ম-প্রতারণা। দুপুরের রোদে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত দেহ-মন আমার একটি ছায়া-নীড়ের প্রত্যাশায় আকুল হ'য়ে উঠেছে, নিঃসঙ্গ রোগ-শয্যায় শুয়ে শুয়ে একখানি সেবা-শীতল হাত খুঁজেচি, তবু তোমার কাছে যেতে পারিনি! নিজেকে এমনি ক'রে ঠকিয়েছি! সাকী, কেবল তোমার দুঃখটাই বড় ক'রে দেখলে?

অশান্তকে অতখানি বিচলিত হ'তে দেখলুম সেই প্রথম। ভেবেছিলুম, বৃহত্তর মুক্তি ও সর্ব্ব মানবের কল্যাণের বেদী-মূলে যারা নিজেদের বলি দিয়েছে, ভাবী পৃথিবী রচনার সুকঠিন দায়িত্ব যাদের, তারা বুঝি এই স্বার্থপর পৃথিবীর সমস্ত কামনা-বাসনাকে জয় ক'রে ফেলেছে! কিন্তু তা' নয়,—কামনা তাদের মরেনি, বিরহী বিধাতার মতোই তাদের তৃষ্ণাতুর অতৃপ্তি

তারায় তারায় চীৎকার ক'রে মরছে ! ভুলে গিয়েছিলুম, অশান্তও মানুষ—আমাদেরই মতো দুর্ব্বল মানুষ !

সাকিনা ততক্ষণে অশান্তর শিয়রে এসে দাঁড়িয়েচে। দুই চোখ ও-র অশ্রুতে প্লাবিত হ'য়ে গেছে, তবু ভিজা মুখে অপূর্ব্ব একটি সহানুভূতির স্বর্ণাভা ! কী প্রগাঢ় স্নেহে ও আস্তে আস্তে অশান্তর আনমিত মাথায় হাত বুলোচ্ছে !

স্তব্ধতা !

সাকিনার মুখে একটিও কথা নেই, আমারও না। মনে হ'তে লাগল, এত নিকটে থেকেও ওই দুটি নর-নারীর মধ্যে কী বিস্তীর্ণ ব্যবধান ! বহুদূর দেশ থেকে ও-রা যেন মনে মনে আলাপ করছে, আর ঘরের দুঃসহ স্তব্ধতা সেই সুদূর আলাপনের নিঃশব্দ ভাষায় মুখর হ'য়ে উঠছে !

বাইরে থেকে বন্ধ দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা গেল। কে ডাকছে, বেয়ারা হবে হয়ত, হোটেলে খাবারের সময় হয়েচে বোধ করি। দরজা খুলে দিলুম। কিন্তু তার আগেই অশান্ত স্প্রীংয়ের পুতুলের মতো লাফিয়ে উঠে দরজার পাশে দেয়ালের গা ঘেঁসে দাঁড়াল। কারণটা ঠিক বুঝলুম না। দরজা খুলতেই দেখি যে এসেছে, সে হোটেলের খানসামা নয়, দামী বিলিতি পোষাক-পরা মাঝারী বয়সী এক ভদ্রলোক। বাঙালী ব'লে মনে হ'ল না। বলিষ্ঠ গড়ন, তামাটে গোছের গায়ের রঙ, মুখের আকৃতি মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের। ওপরের ঠোঁটে যে ক'টি কটা রঙের গোঁফ আছে, আঙুলে তা' গোণা যায়। চকিতে একবার

আমার আপাদমস্তকে ছোট ছোট চোখের অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে, অত্যধিক বিনয়ের সঙ্গে লোকটি ইংরাজীতে প্রশ্ন করলে,—অশান্ত রায় এই কামরায় থাকেন না ? মাপ করবেন, আমি তাঁর একজন পুরাণো বন্ধু বলেই জান্‌তে চাইছি।

অভ্যর্থনা ক'রে বললুম,—ভেতরে এসে বসুন।

মাথার টুপিটি খুলে লোকটি ঘরের মধ্যে পা দিয়েচে, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ গতিতে অশান্ত সাঁ ক'রে খোলা দরজার দিকে পিঠ ক'রে দাঁড়াল। তারপর হা হা ক'রে হেসে উঠে বললে—Hallo, old donkey, after an age, eh !

অশান্তর এই আকস্মিক অভ্যর্থনায় আগন্তুকটির মুখ স্মিত হাস্যে ভ'রে উঠল। সে অশান্তর দিকে দক্ষিণ হাতখানা বাড়িয়ে দিলে।

অশান্ত করমর্দ্দন করে' দরজাটা ফের ভেজিয়ে দিয়ে সোফায় এসে বস্‌ল। হেসে ইংরাজীতেই বল্‌লে, হিন্‌-থ তুমি !. আমি ভেবেছিলুম আর কেউ। তাই একটু সতর্ক হয়েছিলুম।

হিন্‌-থর মুখ এবার গম্ভীর হ'য়ে এল। অশান্তর কাঁধে একখানা হাত রেখে বললে, এখনও কিন্তু অসতর্ক হবার কোন কারণ ঘটে নি। তোমাকে সতর্ক করতেই আমার আসা।

—Is that so ! আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু বড় দেরী হ'য়ে গেছে কি ?

হিন্‌-থ বলতে লাগল,—রূপেশ তোমার সন্ধান পেয়েচে রয়। এতক্ষণ হয়তো ওরা হোটেলের ফটকের কাছে এসে পড়ল।

অশান্ত বল্‌লে, নৃপেশ! এখনো সে তা'র টাকার শোক ভুল্‌তে পারে নি! সে টাকা নৃপেশ গরীবকে ফাঁকি দিয়ে নিয়েছিল, ফাঁকি আমিও ওকে দেব।

তারপর ক্ষণকাল কি যেন ভেবে এবার বাংলায় বল্‌লে, আচ্ছা, তবে আসি! তোমার কাছে প্রেম নিবেদন করবার অবসর পেলুম না বলে' কিছু মনে কোরো না সাকী। ভবিষ্যতে যদি আবার দেখা হয়, তখন আবার চেষ্টা করা যাবে—আপাততঃ তোমাদের এখুনি স'রে পড়তে হবে।

এ অকারণ ব্যঙ্গের কোনো মানে খুঁজে পেলুম না। অশান্ত চিরকালই এমনি দুর্ব্বোধ্য, অসঙ্গত।

সাকিনা যেন পাথর হ'য়ে গেছে!—মুখে পাণ্ডুর ভীতি, চোখে বিমূঢ় ব্যাকুলতা! এবং আমার সমস্ত চেতনা কেমন অভিভূত হ'য়ে এল। চোখের ওপর মন নিয়ে এমনি ক'রে জুয়াখেলা আর কখনো দেখিনি। কিন্তু আশ্চর্য্য ওই অশান্ত! জীবনে ও-র সব চেয়ে বড় যে সমস্যা, তারি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ও এমনি সহজ স্বরে কথাবার্ত্তা কইচে, যেন কিছুই ঘটেনি! ওর মুখের নিরুদ্বেগ প্রশান্তি দেখে কে বলবে, এই কয়েক মুহূর্ত্ত আগে সাকিনার একটা কথার আঘাতে ও-র বুকে অতখানি উদ্বেলতা জেগেছিল!

অশান্ত বল্‌লে, এই হিন্‌-থ আমায় বহু বিপদ থেকে বাঁচিয়েচে। হিন্‌-থ আমার বন্ধু। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে, আজ অতিথিকে এক কাপ কাফি দিয়েও সমাদর করতে

পারলুম না।—থাক্‌গে, অতিথি-সৎকার আগামী একদিনের জন্যে মুলতুবী থাক্‌। তোরা এখন যা'—সাকী যাও।

দরজার এক পাশে স'রে অশান্ত পথ করে দিলে। তবুও যাবার উৎসাহ এল কৈ! এম্‌নি ক'রে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে লজ্জা বোধ হচ্ছিল। কিন্তু ঘরে আমার মা আছে পথ চেয়ে; সেবার কথা মনে পড়ল—দুই চোখে তার কী নির্ভরতা! আর, সেই যে একটী পলাতকা মেয়ে, দু'চোখে একখানি অশ্রুসিক্ত মিনতি নিয়ে অভিমানে আমার দ্বার থেকে একদিন ফিরে গেছল—আমি অশান্ত নই, আমাকে পালাতে হবেই।

কিন্তু হঠাৎ এক কাণ্ড বাধিয়ে বস্‌ল সাকী। একটি লহমার মধ্যে পুনরায় ও-র আত্মস্থতা ফিরে এল। স্থির দুই চোখ অশান্তর মুখের পানে তুলে ধ'রে, কণ্ঠে একটি অবিচল দৃঢ়তা নিয়ে বললে,—যাব না আমি—কিছুতেই না।

অশান্তর মুখ কঠিন হ'য়ে উঠল। রূঢ়স্বরে বললে,—নাটুকেপনা করবার সময় এ নয় সাকিনা, অজয়ের সঙ্গে চলে যাও—দেরী হ'লে বিপদ্‌ বাধবে।

ঊর্দ্ধমুখী ফুলের মতো মুখটি তুলে সাকী এবার অশান্তের বুকের একান্ত সন্নিকটে সরে গেল—তারপর অপরূপ করুণ মিনতিতে কণ্ঠটী সিক্ত ক'রে বলতে লাগল,—তোমার কাছে প্রার্থনা করচি অশান্ত, এতখানি নিষ্ঠুর হয়ো না, আমায় থাকতে দাও; যেতে আমি পারব না—তাড়িয়ে দিলেও না।

সমস্ত ঘরের মধ্যে যেন রোমাঞ্চকর একখানা নাটক অভিনীত

হচ্ছিল! একদিকে কর্ত্তব্যের সঙ্গে মুখোমুখী বোঝাপড়া, অপর-দিকে নারীর মিনতি-ব্যাকুল আত্ম-সমর্পণ! কী অদ্ভুত ওই দু'য়ের দ্বন্দ্ব! অশান্তের বুকটা কি সত্যিই পাথর দিয়ে গড়া? না, অন্তরোদ্বেলিত সমুদ্রের মতো বাইরেটা ও-র আপাত-প্রশান্ত?

ঠোঁটটা কামড়ে ধ'রে অশান্ত কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে নিঃশব্দে কি ভাবলে। তারপর তার গম্ভীর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হ'য়ে উঠল, —বেশ, তা' হ'লে তুমিই থাক সাকী! আমাকে কিন্তু যেতে হবে। হিন্-থ, নৃপেশের আমন্ত্রণ আমাকে স্বীকার করতে হ'ল—

অশান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হ'ল, কিন্তু তার আগেই সাকী আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে উঠল,—যাচ্ছি, আমি চলে যাচ্ছি।

সারা দেহ তখন ও-র থর্‌থর্ ক'রে কাঁপচে, মুখের বর্ণ হ'য়ে উঠেছে পাংশু। মাতালের মতো টল্‌তে টল্‌তে সাকিনা আমার হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অশান্ত একটা বিদায়-সম্ভাষণ পর্য্যন্ত করল না। জানলার হুকের সঙ্গে সে তখন একখানা কাপড় পাকিয়ে বাঁধচে। ওকে অগোচরে পালাতে হবে। প্রকাশ্য-পথ আজ বন্ধ!

একটা বিমূঢ় উত্তেজনায় আমার চেতনা যেন আচ্ছন্ন হ'য়ে আস্‌ছিল। কিন্তু এদিকে সাকীরও অর্দ্ধ অচেতন দেহ আমারি বাহু-বন্ধনের মধ্যে তখন এলিয়ে পড়েছে।

মূর্চ্ছাহতা সাকিনাকে নিয়ে সে রাত্রি আমাদের পথে পথেই কেটে গেল। আহত-হৃদয় নিরুপায় ওই মেয়েটিকে অত রাত্রে পথ ছাড়া আর কেই বা আশ্রয় দেবে? ভোরের আলো যখন ফুটল, আমাদের ট্যাক্সি তখন আহিরিটোলার কাছে এসে পড়েচে। ওই অঞ্চলে যে খালি বাড়ীটা প্রথমে চোখে পড়ল, সেইটাই ভাড়া নিয়ে, পথশ্রান্তা নিরাশ্রয়া মেয়েটির বিশ্রামের বন্দোবস্ত করলুম। সাকীর ততক্ষণ লুপ্ত চেতনা ফিরে এসেচে। চোখের কোলে ক্লান্তির রেখা, বিশুষ্ক মুখে প্রভাতের বাসি ফুলের ম্লানিমা, সমস্ত চেহারায় রুক্ষতা। এ যেন সে সাকী নয়! এ সাকীর চোখে কেমন অর্থহীন অচঞ্চল চাহনি, পাথরের

মতো কঠিন ঔদাসীন্যে সারা দেহটি ও-র আড়ষ্ট; ঝড়ের পর যেমন সমুদ্র! এ-সাকীকে আমি চিনতুম না।

নতুন বাড়ীটায় থাকবার একটা মোটামুটি ব্যবস্থা করে, একটা দরোয়ান রেখে যখন বিদায় চাইলুম, সাকী ছোট ক'রে জবাব দিলে,—আসুন।

কিন্তু আশ্চর্য্য, এতক্ষণের মধ্যে একটিবারও অশান্তের কথা শুধোলে না! অশান্ত নামে একটি ছেলের সঙ্গে কোনো কালে ও-র যে পরিচয় ঘটেছিল, কে তা বলবে? বিস্মৃতির ভস্মস্তূপের তলায় অশান্ত কি ও-র মনে সমাধি লাভ করল—চিরকালের জন্যেই?

পরদিন সকালে যখন আহিরিটোলার বাড়ীতে গেলুম, ছোট বাড়ীটি তখন পরিচ্ছন্ন হোয়ে উঠেচে। দরোয়ানটা বললে, মাঈজী দোতলায়। দোতলার পূবমুখো ঘরটিতে সাকিনা একা চুপ করে বসেছিল। কোলের ওপর হাতদুটি জোড় করা, মুখে সকালের রোদ এসে পড়েচে, পিঠে স্নানসিক্ত কালো চুলের স্তূপ। একটি দিনের মধ্যেই সাকিনা কত রোগা হয়ে গেছে! কী প্রচণ্ড ঝড় যে ও-র দেহ-মনের ওপর দিয়ে ব'য়ে গেছে, আমি তা' জানি। তবু শীর্ণ মুখে তাপসী গৌরীর মতো কী পবিত্র তপঃ-প্রভা! কোনো সুদক্ষ ভাস্কর যদি একটি প্রভাতী সুরকে রূপ দিত, তাহ'লে সাকিনার সেই মুহূর্ত্তের মূর্ত্তিটিকেই হয়ত' গড়ে তুলত।

শুধোলুম,—নতুন বাড়ীতে এসে কোনো অসুবিধে হচ্চে?

—না, অসুবিধে আর কি ?—একটু হেসে সাকিনা বল্‌লে।

—আর কিছু দরকারী জিনিষ-পত্র যদি কিন্‌তে বাকী—

সাকিনা বললে,—কিছু না।

জিজ্ঞেস্ করলুম,—এখন একটু সুস্থ বোধ করচেন কি ?

ছোট ক'রে সাকিনা জবাব দিলে,—হ্যাঁ।

এর পরে আর কি কথা বলা যেতে পারে, ভেবেই পাইনে। সাকিনার বসবার উদাসীন ভঙ্গীটি একটি অনুচ্চারিত প্রার্থনার মতো পবিত্র মনে হয়। সেদিনের সেই সদ্য জাগ্রত নগরীর প্রাত্যহিক কোলাহল ছাড়িয়েও যেন কোন সুদূর আলোর অলকায় চলে গেছে ও, ঘরে থেকেও ঘর থেকে বিচ্ছিন্ন যেন; কেমন একটি প্রশান্ত নির্লিপ্ততা ও-র সর্ব্বাঙ্গে মাথা! সুমুখের খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে—গঙ্গার তীরে কারখানার চিম্‌নীর সর্পিল ধূমকুণ্ডলী, নীলোজ্জ্বল আকাশে পথহারা একটা চিল ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে। অশান্তকে মনে পড়ে গেল। অশান্তর মতো অকূল আকাশে ও দুই পাখা মেলে দিয়েছে,—কিন্তু নীড়ের তৃষ্ণা ও-র মিটেছে কি ?

স্তব্ধতা ভেঙ্গে বললুম,—অশান্তর কোনো খবর পেয়েচেন ?

পশ্চিমের খোলা জানলা দিয়ে গঙ্গার অপর তীর দেখা যাচ্ছিল। পিঁপ্‌ড়ের সারির মতো লোক চলা-চল হ'চ্ছে। সাকী সেই দিকে তাকিয়েছিল। মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিলে, পাবার কোনই দরকার বোধ করিনি।

বললুম,—এটা তো হ'ল অভিমানের কথা। কিন্তু—

অকস্মাৎ মুখ ফিরিয়ে তীব্র কণ্ঠে সাকিনা বলে উঠল,—অভিমান! কার ওপর? কিসের জন্যে! অজয়বাবু, আমরা মেয়েমানুষ—দুর্ব্বল বটে, কিন্তু ভিক্ষা-বৃত্তিতে আমাদের লজ্জাবোধ হয়।

বললুম,—কিন্তু আপনি ত' জানেন, ঘর বাঁধা অশান্তর পক্ষে সম্ভব নয়। পথেই যে জীবন উৎসর্গ করেচে—

বাধা দিয়ে সাকি বললে,—নারীকে আপনারা শুধু প্রয়োজনের বস্তু বলেই জেনেচেন, মনের মিতা ব'লে নয়। কিন্তু নারী শুধু বাঁধতেই জানে না,—এগিয়েও দিতে পারে। আমাকে বাদ দিয়ে আপনার বন্ধুর মুক্তির আয়োজন একদিন বৃথা হ'য়ে যাবে, ব'লে রাখলুম, সেদিন তাকে আমার কাছে ফিরে আসতেই হবে—বিশ্রামের প্রত্যাশায় নয়, আমারি হাত ধ'রে আবার পথে বেরিয়ে পড়বার জন্যে। সেই দিনের অপেক্ষায় রইলুম আমি—

আগুনের ফুলকির মতো সাকীর কথাগুলো ঘরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ধীরে ধীরে নিভে গেল। অত বড় আত্ম-প্রত্যয়ের জবাব দেওয়া কি যেতে পারে? অখণ্ড একটী নীরবতা ঘরময় বিরাজ করছে, তর্ক ক'রে তাকে আঘাত দিতে ইচ্ছে হ'ল না। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকবার পর, বললুম,—উঠি এখন।

—যাচ্ছেন নাকি?—সাকিনা শুধোলে।

বললুম,—হ্যাঁ, কাজ আছে একটু। বেলেঘাটার হাঁসপাতালে যাব একবার। সেখানকার তদারকের সমস্ত ভারই অশান্ত আমায় দিয়ে গেচে।

সাকিনা উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যাবেন অজয়বাবু? একটা কিছু কাজ না পেলে, এই সঙ্গী-হীন ঘরের মধ্যে আমার হয়ত' আত্মহত্যা করতে হবে।

বললুম,—নিয়ে যেতে আপত্তি নেই, কিন্তু সে জায়গাটা আপনার কাছে বিশেষ প্রীতিকর ঠেক্‌বে না বোধ করি।

কোনো কথা না ক'য়ে সাকিনা সাদা খদ্দরের একখানা চাদর গায়ে জড়িয়ে এল।

বেলেঘাটার বস্তির ওপর তখন প্রভাতের রৌদ্রালোক আশীর্ব্বাদের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু যারা গরীব অশিক্ষিত, জীবন যাদের কলঙ্কিত—রুগ্ন, গ্লানিময়, প্রভাতের আশীর্ব্বাদে তাদের কি আসে-যায়? পাপ আর পাঁকের তলায় রুদ্ধ-শ্বাস মানুষ বাঁচবার জন্যে আর্ত্তকণ্ঠে শুধু চীৎকার করছে। সরকারী কলের কাছে নিত্যকার নিয়মানুযায়ী বস্তি-বাসিনীদের তুমুল বচসা আর ইতর সম্ভাষণ সুরু হ'য়ে গেছে। চার-পাশের সেই পঙ্কিল জীবন-যাত্রার মাঝে সাকিনাকে সঙ্গে নিয়ে চল্‌তে আমারি লজ্জাবোধ হচ্ছিল।

হাঁসপাতালের সুমুখে তখন ছোট-খাট একটি ভীড় জমে উঠেছে। খবর নিয়ে জান্‌তে পারলুম, গত পরশু রাত্রে যে কুলিটী মোটর চাপা পড়ে এখানে এসেছিল, আজ ভোরে তার শেষ হ'য়ে গেছে! সৎকারের জন্যে দড়ির একটা খাট আনা হয়েছে,

কিন্তু মুস্কিল বাধিয়েছে মংলুর বৌ লখিয়া ! মংলুর বয়স বাইশ পার হয়নি। লখিয়াকে ও বিয়ে করেছিল মাত্র দেড় বছর আগে। বাসরের সুখ-স্বপ্ন তখনো লখিয়ার চোখের তারা থেকে মুছে যায় নি। মংলুর মৃতদেহকে কিছুতেই ও নিয়ে যেতে দেবে না ; ও-র বিশ্বাস, চেষ্টা করলে মংলুকে এখনো বাঁচাতে পারা যায় ! ঘোম্‌টা খসিয়ে, চুল এলিয়ে, শোকাতুরা মেয়েটি যেন উন্মাদিনী হ'য়ে উঠেছে।

চেয়ে দেখি, সাকিনা পাণ্ডুর মুখে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্তম্ভিত হবার কথাই বটে ! মৃত্যুর এতখানি নিষ্করুণ হৃদয়-হীন রূপের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে সম্ভবতঃ ও-র পরিচয় ঘটেনি।

বললুম,—অবাক্ হবার কিছুই নেই এতে। এখানকার মৃত্যু এম্‌নিই।

সাকিনা যেন চেতনা ফিরে পেয়ে বল্‌লে,—কিন্তু এত বড় অবিচারের প্রতিকার নেই ?

হাসি এল। বললুম,—প্রতিকার আবার কি ? খুঁজলে দেখা যেত, যে মোটর মংলুকে চাপা দিয়েছিল, সেই মোটরই তারপরে হয়ত' 'লেক্'-এর ধারে ঘুরে বেড়াচ্চে! গরীবের জীবনে প্রতীকার নেই, থাক্‌লে—থাক্‌গে সে-সব কথা, চলুন আমরা ভেতরে যাই।

ভেতরে লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা হ'ল। ও-কে অশান্তর কথা জিগ্যেস ক'রে জান্‌লুম, সেই রাত্রে লক্ষ্মীর ঘরে ও আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর ভোরবেলায় তাকে আর খুঁজে পাওয়া

যায়নি ! এসেছিল যেমন না-ব'লে, চলেও গেছে তেমনি না জানিয়ে। অশান্ত এম্‌নিই অদ্ভুত ! কথা কইবার সময় লক্ষ্মীর মুখে একটি স্বপ্নময় তন্ময়তা লক্ষ্য করলুম ; যেন স্তোত্র পাঠ করছে—এমনি সসম্ভ্রমে ও অশান্তের নামটি উচ্চারণ করলে ! সেই হীন-জীবিনীর তমসাচ্ছন্ন জীবনে অশান্ত কোন্ প্রভাতের বাণী দিয়ে গেছে, কে জানে ?

প্রত্যেক বিছানার কাছে ঘুরে ঘুরে হাঁসপাতালের দৈনিক রিপোর্ট নিলুম। আশে-পাশে রোগীদের কাৎরাণি। ছোট একটি ভিখিরীর ছেলে বিকারের ঘোরে বলছিল,—আমায় একটা লাল টুক্‌টুকে জামা কিনে দেবে মা ?

চেয়ে দেখি, সেই ভিখিরীর ছেলেটির জ্বর-তপ্ত ললাটে স্নেহ-শীতল একখানি হাত রেখে সাকিনা দাঁড়িয়ে রয়েছে, গালের ওপর জলের ধারা !

বললে,—কাজ আমি খুঁজে পেয়েছি অজয়বাবু, বেলেঘাটার এই হাঁসপাতালই আমার তীর্থ।

বাড়ী ছেড়ে, সংসার ছেড়ে বেলেঘাটার সেই বস্তীর মধ্যেই ছ'টী মাস কাটিয়ে দিলাম—মানুষের রোগের মাঝখানে, রুগ্ন মানুষের মাঝখানে। দিনের পর দিন কাটবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, এখানকার আকাশের রং যেন আলাদা ; এখানকার নর-নারী যেন আমাদের দেশের লোক নয় ; এরা এক অপরিচিত, স্বতন্ত্র পৃথিবীর অধিবাসী। এরা খেতে না পেলে অদৃষ্টকে অপরাধী ক'রে পাপ ও পঙ্কিলতার মাঝখানে ধীরে ধীরে নিরুদ্বেগে তলিয়ে

যেতে থাকে ; তবু মুখ ফুটে প্রতিবাদ করে না ! সবাই এদের লক্ষ্মী নয়, চপলা ত' নয়ই।

একদিন স্থলাল ব'লে একটি ছেলেকে বললুম,—কাল রাত্রে তোমার বউকে মেরেছিলে কেন? কেন মেরেছে তা আমি জান্‌তাম ; গত রাত্রে স্থলাল মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরেছিল।

উত্তরে স্থলাল বল্‌লে,—আমার ইস্তিরিকে আমি শাসন কর্‌ব, আপনি বলবার কে?

স্ত্রীর উপর তার অধিকার যে অখণ্ড, সে বিষয়ে স্থলাল নিঃসন্দেহ। তবু তাকে বললাম,—শুনেছি কাল রাত্রে তুমি যখন বাড়ী ফেরো, সেই সময় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল ; এই ত' দোষ? তার জন্যে তুমি এমন মার মার্‌লে যে, আমাদের হাঁসপাতালের রুগীগুলো পর্য্যন্ত তার চীৎকারে ভয়ে শিউরে উঠল। তা' ছাড়া তুমি মদ খেয়েছিলে—

স্থলাল কান থেকে একটা বিড়ি বার ক'রে ধরাতে ধরাতে বল্‌লে,—ট্যাঁকে টাকা ছিল, ধার ক'রে খাইনি।

এর পর তাকে আর কোন কথা বল্‌বার সাহস হয়নি। অশান্ত হ'লে হয়ত' কিছু বল্‌তে পারত। ওদের সবাই যেমন সুবোধ নয়, আমাদের মধ্যে তেমনি অশান্ত ক'জন? তবু জীবনের যে নির্লজ্জ রূপ প্রতিদিন আমার চোখে পড়ে, তা' দেখে চোখে জল আর আসে না ; লক্ষ্মীকে লাগিয়ে দিলাম—মেয়েদের মধ্যে আলোক-শিখাটী বহন ক'রে নিয়ে যেতে ; অশান্তর কথা মতো মাঝে মাঝে কুলী-মজুরগুলিকে জড় করে বক্তৃতাও দিতাম।

এমনি ক'রেই ছটি মাস।...

বাড়ী থেকে একদিন চিঠি পেলুম। মা লিখেছেন—কাশীতে রামতারণের মৃত্যু হয়েছে হৃদ্‌রোগে। তা ছাড়া সেবার বিয়ের ঠিক হ'য়েছে, আমার একবার মা'র সঙ্গে দেখা করা দরকার। চিঠি পেলাম রাত্রে। কাজেই পর দিন যাব স্থির কর্‌লুম; সন্ধ্যের মধ্যেই আবার ফিরতে হবে।

রামতারণ নেই। না থাকাই ত' স্বাভাবিক। ঊষা বাড়ী ছেড়ে কোথায় গেছে জানি না, কিন্তু তার চেয়ে বেশী দুঃখ ভোগ করে গেলেন নিঃশব্দে শুধু রামবাবু। হৃদয়হীন লোকাচার এবং নিতান্ত সঙ্গতিহীন চক্ষুলজ্জা নিল তাঁর বুকের রক্ত শুষে। ঊষা এখন কোথায়, এই পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে? দেখা হ'লে তাকে বল্‌তাম—কি বল্‌তাম জানি না! হয়ত' কেবল মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌তাম, কিছুই বল্‌তাম না!

ভাবতে ভাবতে রাত ঢের হ'য়ে গেল। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে কখন, কিছুই খেয়াল ছিল না। অন্ধকারে জলের ধারা জানালার কাচের বুকে চোখের জলের মতো গড়িয়ে পড়ছে।

হঠাৎ দ্বারে করাঘাত।—এত রাত্রে কে, অশান্তই বুঝি? দরজা খুলতেই ভুল ভাঙ্‌ল,—অশান্ত নয়, পুলিশ। আমাকেই চায় তারা।

সাদা পোষাক পরা লোকটী ওয়ারেণ্ট দেখাল। আমি নাকি কুলী মজুরদের উত্তেজিত করে বেড়াচ্চি। কি জন্যে তাদের উত্তেজিত করচি এবং সত্যিই করচি কি না, তা নিয়ে তর্ক করতে

পারতাম, কিন্তু তাতে বুঝি কেবল কথাই বেড়ে উঠবে। দীন দুঃখী, অসহায় বঞ্চিতদের জন্য আমি আমার অন্তর-লোকে যে বেদনা বোধ করেছি, তা' একান্ত আমারই এবং তা আমার মধ্যেই থাক্। সরকারী কর্ম্মচারীটির কর্ত্তব্য-সম্পাদনে বাধা দিলাম না।

সাকী এল, লক্ষ্মী এল।

বল্‌লাম,—ডাক এসেচে দিদি, রাজার বাড়ীর অতিথ হবার। বাড়ীতে একটা খবর দেবার দরকার হবে। মা যেতে লিখেছিলেন।

সাকী বল্‌লে,—তোমাকে ধরতে এসেচে, কেন?

বল্‌লাম,—কেন নয়? আমাকে ধরাটা ওদের নিতান্ত দরকার, তাই।

বুঝলুম, সাজা একটা হবেই। আশন্তকে ও-রা পায়নি, কিন্তু আমাকে পেয়েছে। অশান্ত আমার বন্ধু, অশান্ত আমার গুরু।

লক্ষ্মীর হাত চেপে বল্‌লাম,—তোরা ভাবিসনে। দিদি রইলেন, কাজ বন্ধ থাকবে না।

অতগুলি দিন ও রাত্রি কাটাতে, কবে যে সেই কুৎসিত পল্লী ও তার ততোধিক কুৎসিত নর-নারীগুলিকে ভালবেসে ফেলেছি, তা' জান্‌তে পারলুম যখন যাবার মুহূর্ত্তটি অত্যন্ত কাছে এসে দাঁড়াল। চোখের জল ফুরিয়ে গিয়েছিল অনেক দিন আগেই—অন্ততঃ তাই ভাবতাম। কিন্তু সেদিন রাত্রে কর্দ্দমাক্ত পথ চল্‌তে চল্‌তে আকাশের জলের সঙ্গে চোখের জল গেল মিশে! অসংখ্য সহায়হীন নর-নারীর কথা ভেবে বুকের অতলে একটী নিঃশব্দ দীর্ঘ নিশ্বাস ঘনিয়ে উঠল।

জেল-হাজতে মা এলেন দেখা করতে, সঙ্গে সেবা। ভেবেছিলুম মা হয়ত' ছেলে মানুষের মতো কেঁদে ভাসাবেন, কিন্তু তাঁর মুখে একটী অটুট প্রশান্তি দেখে আশ্বস্ত হলাম। তিনি নিঃশব্দে আমার হাতখানি চেপে ধ'রে বল্লেন,—উকীলের ব্যবস্থা করেচি, কাল তোর সঙ্গে তিনি দেখা করতে আসবেন।

বললাম,—না, তাতে কোন লাভ হবার সম্ভাবনা নেই, সাজা হবেই। মিথ্যে কতকগুলো পয়সা নষ্ট ক'রে লাভ কি?

মা আর কিছু বল্লেন না। সেবা হতভম্বের মতো আমার দিকে চেয়েছিল, কিন্তু কাঁদলে না। ও-রা কি করে অতটা শক্ত হ'য়ে উঠল, ভেবে আশ্চর্য্য না হ'য়ে পারি না।

মার মুখে শুনতে পেলাম, রাধু চিঠি লিখে রামবাবুর মৃত্যুর খবর দিয়েছেন। শেষের ক'মাস রামবাবু নাকি রাত্তিরে ঘুমোতে পারতেন না, ভূতের মতো ঘরময় ঘুরে বেড়াতেন। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা আরো যে, রাধুর মনেও কোথায় যেন ভাঙ্গন ধরে গেছে! তিনি লিখেছিলেন, হতভাগীকে একদিন কতই না গালমন্দই দিয়েচি, তবুও আজ তার অদৃষ্টের কথা ভেবে চোখে জল না এনে পারি না।

জেল হ'ল; হবেই জানতাম। আদালতে সেদিনও মা এলেন,—সাকী, লক্ষ্মীও। সাকী আর লক্ষ্মী মায়ের সঙ্গে ভাব ক'রে ফেলেছে, দূর থেকে দেখলুম। বেলেঘাটার দু'চার জন

কুলী মজুরও এল। আমায় দণ্ড দিয়ে দেশের কতটুকু লাভ ক্ষতি হবে সে কথা ভাববার আগে, ও-দের দিকে চেয়ে আমার চোখের কোলে জল দেখা দেয়। ও-দের জন্যে কতটুকু উপকারই বা করেচি? তবু ও-রা আমায় ভোলেনি! সাকিনার মুখে একটি অবিচলিত নিষ্ঠা, লক্ষ্মীর মুখে আনন্দের আভা। তবুও একটি অনুপস্থিতার জন্যে মনের কোথায় যেন নীরবে বেদনার মেঘ উঠে ঘনিয়ে! ভাবি, তারই মুখের দিকে চেয়ে একদিন আমি বন্দিনী দেশ-জননীর স্বপ্ন দেখেচি, তারই চোখের জল একদিন আমার বুকে আগুনের ফুল্‌কী হ'য়ে জ্বলেচে; অথচ, আজ সে আমার সমস্ত কল্পনাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিয়ে কোথায়, কত দূরে চলে গেছে, তা' জানবার উপায় পর্য্যন্ত নেই!

সাকিনার মুখ দেখে বুঝলাম, আমাদের কাজ চল্‌বে, লক্ষ্মীর উৎসাহ সে কাজকে উজ্জীবিত ক'রে রাখবেই। অশান্ত উধাও হয়েও যেন ও-দের সকলের মাঝখানে রয়েছে।

এক বছর পরে একদিন আমায় ছেড়ে দেওয়া হ'ল ঢাকার জেল থেকে। জেল হবার পর আমায় আর কল্‌কাতায় রাখা হয়নি। জেল থেকে খালাস পেলাম এমন সময়, যখন তার জন্যে তৈরী হ'য়ে উঠতে পারিনি। ট্রেণে উঠে একে একে আবার সকলকে মনে পড়ে। বেলেঘাটার প্রতিষ্ঠানটি এতদিনে কি রকম দাঁড়িয়েছে, কে জানে? হয়ত' ফিরে গিয়ে অশান্তকে দেখতে পাব, হয়ত' পাব না।......

অন্ধকার রাত্রি, বৃষ্টি পড়ছে। একটা বড় ষ্টেশনে ট্রেণ থেমেছে। ফেরিওয়ালাদের উপদ্রব, বোধ করি বৃষ্টি এবং রাত্রির নিবিড়তার জন্যে নেই বল্‌লেই হয়। কাছে এবং দূরে কয়েকটা ল্যাম্প

জল্‌চে ঝাপসা হয়ে এবং সেগুলির পাশে রাশি রাশি লোকার ভীড়। দু'একটী যাত্রী নাম্‌লো, দু'একটী গাড়ীতে উঠলো। ক্ষিদে পেয়েছে ব'লে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একটা ফেরিওয়ালার সন্ধান করছিলুম। হঠাৎ দূর থেকে একটী মেয়েকে এগিয়ে অস্‌তে দেখে, নিজের চোখকেই যেন সহসা বিশ্বাস করতে পারলাম না।

উষা,—এতদিন পরে এবং এখানে ? কিন্তু প্রতুল কই ?

একবার ভাবলুম, নাম ধ'রে ও-কে ডাকি ; তখনই কিন্তু অদ্ভুত সঙ্কোচে এবং রাগে জানালা থেকে মুখ সরিয়ে গাড়ীর মধ্যে এসে বসলাম। জীবনের সে কী সংশয়-উদ্বেল একটী মুহূর্ত্ত ! উষাকে দেখলাম, কতকাল পরে, কলকাতা থেকে কত দূরে ; অথচ উষার সঙ্গে প্রতুল নেই। যারা তার সঙ্গী হয়েছে তাদের ইতিপূর্ব্বে কোনদিন দেখিনি। একবার মনে হ'ল, উঠে গিয়ে উষাকে বলে আসি,—রামবাবু নেই। কিন্তু, না, থাক্—উষা আমার কে ?

তবে দেখা তার সঙ্গে হ'লই। কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই আমাদের গাড়ীর দরজা গেল খুলে এবং একে একে অপরিচিত দু'টি লোক এবং উষা এসে উঠল আমাদেরই কামরায়।

এ উষা আর সেই উষা ! আজকের উষার হাতে দামী চুড়ী, পরণে দামী শাড়ী ! সঙ্গের লোক দুটি সম্ভবতঃ মুসলমান। মুটের মাথায় বাঁয়া-তব্‌লা এবং হারমোনিয়ম এবং আরও কি কি ! আজকের উষার চোখে বন-হরিণীর ভীরুতা নেই, নেই সন্ধ্যা-তারার স্বচ্ছতা। আজকের উষা যেন এক পেয়ালা মদ—রাঙা, টল্‌টলে, ফেনিল !

ও-ই আমাকে দেখলে প্রথম। ঠিক ক'রে চিনে নিতে যেটুকু সময় গেল, তারপরই বল্‌লে,—তুমি, অজয়দা'? কিন্তু একি মূর্ত্তি হয়েচে তোমার!

বললুম,—ঠিক এই কথাই তোমায়ও জিজ্ঞাসা করা যায় ঊষা। একি মূর্ত্তি তোমার?

ঊষা হঠাৎ জবাব দিল না। ও-র সঙ্গী দুটি অদ্ভুত ভাবে আমার দিকে চাইল। আমিও চুপ করেই রইলুম। যখন বলবার কথা অনেক, তখন হঠাৎ কিছুই মনে পড়ে না; কিম্বা সবগুলো একসঙ্গে মনে পড়ে গোল পাকিয়ে যায়।

জানালার কাচ বেয়ে বৃষ্টির জল গড়াচ্ছে—মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোয় তা' দেখা যায়। ট্রেণের অবিশ্রাম চলার শব্দ আমাদের মনের স্তব্ধতাকে যেন কথা বলবার জন্যে বারবার আঘাত করতে থাকে।

খানিক পরে ঊষাই কথা বললে।

বললে,—এদিকে কোথায় এসেছিলে শুনি? তার কণ্ঠস্বর সহজ, জড়তা-হীন। বললুম,—আমিও তোমার কাছে ঠিক সেই কথাই জানতে চাই ঊষা। ঊষা একটু হাস্‌ল।—বাহিরের চকিত বিদ্যুৎ-রেখার সঙ্গে সে হাসির হয়ত' অদ্ভুত একটা মিল ছিল।

বললে,—এসেছিলুম কাছাকাছি। কিন্তু সে কথা শুনে কোন লাভ নেই অজয় দা'।

ও-র মুখের শেষ কথাটা কানে যেন কেমন লাগল। কতদিন পরে, কিন্তু কত সঙ্কোচের সঙ্গে কথাগুলি সে উচ্চারণ করলে!

একটু থেমে ঊষা সঙ্গের লোক দুটির দিকে চেয়ে বললে,—তোমরা বাঙ্কে বিছানা ক'রে শুয়ে পড় ওস্তাদজী ! আমার এখন ঘুমুতে অনেক দেরী।

লোক দুটি আর একবার আমাদের দিকে চাইল। কি ভাবলে, তারাই জানে। ওপরে উঠে তারা বিছানা পাতবার উদ্যোগ করতে থাকে। ঊষা সামনের বেঞ্চিটার উপর বসে প'ড়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে,—গিয়েছিলুম মুজরো করতে এক জমিদার বাড়ী ; এঁরাই সঙ্গে এসেছিলেন।......শুনে বোধ হয় আশ্চর্য্য হলে, নয়—?

যে সন্দেহটা গোড়া থেকেই মনের মধ্যে উঁকি মারছিল, অথচ বিশ্বাস করা যেটা একান্ত কঠিন, হঠাৎ সেটা যেন দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ হয়ে গেল। ঊষার প্রশ্নের উত্তরে কোন কথা বলবার প্রবৃত্তি হ'ল না। কিন্তু ঊষা অতি মাত্রায় প্রগলভা এবং চটুল। নিজেই বলতে লাগল,—প্রতুল বাবু কোথায়, সে কথাটা তোমার বোধ হয় জানবার কৌতূহল হচ্চে, অজয় দা ?

—হওয়া বোধ করি অপরাধ নয়।

—না, অপরাধ কিছুই নয়। কিন্তু শুনে রাখ যে, প্রতুল বাবু কোথায় সে খবর আমি আর রাখি না ; তিনিও আমার খবর রাখা আবশ্যক মনে করেন না। কিন্তু আমার কথা থাক, অজয়দা' ! তোমাদের কথা কিছু শুনি। কি করছো তুমি ? এখনও কি রাত্রি জেগে তেম্‌নি বইয়ের পাতা খুলে বসে থাক ? সেবা বোধ হয় ইস্কুলে পড়চে ? বিয়ে হয়নি তার ?

—না, সে সব খবর নিয়ে তোমার লাভ ?

—লাভ কিছুই না। তবে এখনও বেঁচে আছি কিনা, তাই তাঁদের কথা মাঝে মাঝে শোন্‌বার সাধ হয়।

বললাম,—আশ্চর্য্য উষা, তুমি এত কথা শিখলে কোথা থেকে ? আরও আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তুমি তোমার নিজের লোকদের কথা একটিবারও জানতে চাইলে না ! জান, বছর দেড়েক আগে রামবাবু মারা গেছেন ?

উষা যেন শিউরে উঠল—ক্ষণকালের জন্য; তার মুখখানি যেন মুহূর্ত্তের মতো পাথর হয়ে গেল। তারপর বেশ স্বাভাবিক গলায় বললে,—হুঁ।

একটা অসহ্য, বিরক্তিকর স্তব্ধতা কিছুক্ষণ। তারপর চেষ্টা করে বললাম,—তোমার বোধ হয় কিছুই বলবার নেই উষা ?

—কি বলবার থাক্‌তে পারে আমার ? থাক্‌লেই বা শুন্‌চে কে ?—

উষা খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল ;—কিন্তু হাসি সে নয়, অবসন্ন সন্ধ্যার ভাঙ্গা মসজিদের ভেতর থেকে প্রার্থনার ধ্বনির মতো করুণ, ভয়াবহ ! হঠাৎ ও-র মুখের দিকে চেয়ে কোথায় যেন তার জন্যে করুণা অনুভব করলাম ; মনে পড়ে গেল সেই উষাকে—যে একদিন সীমন্তিনী হয়েও সেবার সঙ্গে ছুটোছুটি ক'রে বেড়িয়েচে, মনে পড়ে গেল তার সেদিনের অর্থহীন কলরব, দুরন্ত হাসি !—তাকে আজ এমন হতে হল কেন ?

বললাম,—শুনলে তুমি হয়ত' হাসবে উষা ; কিন্তু পৃথিবীতে

এমন লোক আজও আছে, যে তোমার কথা কান পেতে, আগ্রহের সঙ্গে শুনতে পারে এবং সে লোক রয়েচে তোমার অত্যন্ত নিকটে।

ঊষার প্রগল্‌ভতা যেন ঘুচে গেল; মুহূর্ত্তের জন্য মনে হল, জঞ্জালের মাঝখান থেকে পুরাণো ঊষাকে খুঁজে পেলাম। ঊষা শান্ত কণ্ঠে বললে,—জানি অজয়দা। কিন্তু শুনে লাভ হবার সম্ভাবনা নেই এতটুকু।

—পীড়াপীড়ি করে তোমার কথা শোনবার ইচ্ছে আমার নেই।—ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম। আবার গাড়ীর মধ্যে অস্বস্তিকর একটা নিস্তব্ধতা! ঊষা জানালার কাচের উপর কপাল ঠেকিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল। ও-র সঙ্গের লোকদুটি ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েচে। ঊষাকে ওদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে হয় সে কথাটা কল্পনা করাও যেন অসহ্য!

হঠাৎ ঊষা বলে উঠল,—তুমি বিয়ে করেচ অজয়দা?

উত্তর না দিয়ে পাণ্টা প্রশ্ন করি,—কেন?

ঊষা মুখখানা রীতিমত গম্ভীর করে বলে,—না, ঠাট্টা নয় অজয় দা, বিয়ে করেচ কি না বলো সত্যি ক'রে।

বললাম,—যদি করে থাকি, তা হলে?—

ঊষা বললে,—আমার বেশী লোভ নেই অজয়দা; আমি কেবল তাকে একবার দেখবো এবং তার সঙ্গে নিজেকে একবার তুলনা করব।

—অদ্ভুত খেয়াল!

—অদ্ভুতই বটে !—উষা হি-হি ক'রে হেসে উঠল।

গাড়ী চলেচে একটানা দ্রুতগতিতে। কতক্ষণ পরে থাম্‌বে ঠিক নেই। যদি তখনই থামে, তা' হ'লে যেন বেঁচে যাই। নিজেকে নিয়ে ভারি বিব্রত বোধ করছিলুম। কিন্তু চুপ করেই বা থাকা যায় কতক্ষণ ?

নিজেই জান্‌তে চাইলাম,—চলেচ কোথায় ?

উষা বললে,—আস্তানা একটা আছে কল্‌কাতায়, মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে বিশ্রাম নিতে হয়।—যাবে অজয়দা, আমার সঙ্গে ?

—না।

—কেন ?—উষার কণ্ঠে অব্যক্ত কাকুতি !

—না, প্রবৃত্তি হবে না।

উষা হো-হো ক'রে হেসে উঠল। ও-র মুখের সঙ্গে, সর্ব্বাঙ্গের সঙ্গে সেই হাসিটা কী বিশ্রী, খাপছাড়া! বললে,—'প্রবৃত্তি হবে না'—চমৎকার বলেচ অজয়দা! কিন্তু কেন ?

—তোমার সঙ্গে তর্ক করবার মতো উৎসাহ আমার নেই উষা।

উষার মুখের চেহারা ক্ষণকালের মধ্যে বদ্‌লে গেল। চোখ দুটীতে যেন সন্ধ্যার অস্পষ্টতা! বললে,—না, অজয়দা, আজকে তোমায় আমার ওখানে একটীবার যেতেই হবে—যখন তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গে'ছে। আর কোন দিন আমি তোমায় যেতে বলব না ; এই প্রথম আর শেষ।

উষার কণ্ঠের কাকুতি আমার কঠোরতাকে আর্দ্র ক'রে দেয়। আমার নীরবতায় উৎফুল্ল হ'য়ে উষা বললে,—যাবে অজয়দা ?

'না' বলতে পারলুম না। বললাম,—তার আগে তোমার সমস্ত কথা আমি শুনতে চাই।

ঊষা বললে,—লুকোবার কিছুই নেই অজয়দা, সব কথাই তোমায় বলতে পারি, বলবও। কেবল তুমি একবার বল, আমার ওখানে যাবে?

আমাকে তার উৎসব-গৃহে একটীবারের মতো নিয়ে গিয়ে ঊষার কি লাভ হবে বুঝলাম না; বললাম,—বেশ, যাবো।

ঊষা অল্পকাল চোখ বুঁজে বসে রইল—যেন কোন্ স্বপ্ন-সুন্দরের ধ্যানে! তার সেই মুহূর্ত্তের তদ্গত মূর্ত্তির মাঝখানে সেদিন যেন ক্ষণকালের জন্য প্রার্থনার পবিত্রতা খুঁজে পেয়েছিলাম; মনে হয়েছিল, ঊষার জন্যে আমি আকাশ ছিঁড়ে আনতে পারি।

তেমনি চোখ বুঁজেই ঊষা বলতে আরম্ভ করল,—আমার সেই চরম যাত্রার দিনে আমি তোমার কাছেই সকলের চেয়ে বেশী আশা করেছিলুম অজয়দা; কিন্তু তুমি তোমার সেই অসহ্য নীরবতা দিয়ে আমার আশার ঘটে মেরেছিলে লাথি। প্রতুলের সঙ্গে ঘর ছেড়ে বার হলাম;—কেন বার হলাম তা আজও আমি ভাল করে বুঝিনি,—সত্যি অজয়দা, এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যে নেই—বিশ্বাস করো।

শুক্‌নো গলায় কোন মতে বল্‌তে পারলাম,—বিশ্বাস করলুম ঊষা, তুমি বল।

ঊষা আবার খানিক চুপ ক'রে থাকে।

তারপর বললে,—

সত্যি অজয়দা, মানুষের আশার মতো ঠুনকো জিনিষ আর নেই, একটু বাতাসের ভরও তার সহ্য হয় না। প্রতুল কলকাতা থেকে নিয়ে গেল আমায় গিরিডি। নিরালা উশ্রীর ধারে বসে দু'জনে কত অসম্ভব কল্পনাই না করেচি! ইউক্যালিপটাস্ গাছের ছায়ায় ঢাকা পরিচ্ছন্ন দুখানি ঘর—আমাদের দুজনের একটী সংসার! আমরা বিয়ে করব, আমাদের সন্তান একদিন সেই ঘর দুটির বুকে ছুটোছুটি করবে, উদয়াস্ত আমরা এ-ওর মুখের দিকে চেয়ে কাটিয়ে দেব,—আরও কত কি! কিন্তু একটি মাস কাটতে না কাটতে অপর পক্ষের উৎসাহের উৎস গেল ফুরিয়ে। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলুম, তোমার বন্ধুটি নেই!

—আমার বন্ধুর জন্যে আমার দোষ দিলে অন্যায় হবে উষা।

—দোষ আমি কাউকে দিই না, নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে ছাড়া। যাবার সময় প্রতুল যে চিঠিখানা লিখে গিয়েছিল, সেখানি দেখলে তুমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারবে না।

—কি লিখেছিল তাতে?—শুক্‌নো গলায় বলি।

—লিখেছিল,—যে মেয়ে মনে মনে আর একজনের কল্পনায় বিভোর, তাকে নিয়ে ঘর পাতবার দুঃসাহস আমার নেই। আমায় ক্ষমা ক'র উষা।

—সে আর একজনটি কে?

—জানিনা, তুমিও জানতে চেয়োনা। তার কথা সত্যি কি মিথ্যে, সে কথা জানবারও কোন প্রয়োজন নেই। ও শুধু তার ছল, একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে যেতে হয়—তাই।

উষার চোখের পানে চাইলাম—অতলস্পর্শ রহস্যে সে ছুটি মেঘ-মেদুর! বল্‌লাম,—তারপর?

—তারপর গিরিডির সেই ছোট্ট সমাজটিকে ঘিরে আমায় নিয়ে চল্‌ল আলোচনার তুফান! একটি সপ্তাহ সেখানে কি করে যে কাটিয়েচি, তা ব'লে বোঝাবার সাধ্য আমার নেই। প্রথমে ভেবেছিলুম, প্রতুল আমার সঙ্গে দুষ্টুমী করে গিরিডিতেই কোথায় লুকিয়ে আছে, কিন্তু সাতদিন কাটবার পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে হাসি এল। কোথায় যাব, কার কাছে যাব, কিছুই ঠিক না ক'রে একদিন রাত্তিরে ট্রেণে উঠে বসলুম। যখন যাবার পথ জানা থাকে না, তার চেয়ে অসহায় অবস্থা আর নেই। কিন্তু ট্রেণ ছাড়বার কিছু আগে আমার কামরায় যিনি এসে বসলেন, তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন প্রতুলের বন্ধু ব'লে। বলেছিলেন, 'প্রতুল আপনাকে ফেলে পালিয়েচে এ খবর আমি পেয়েচি,—স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার! শুনেছি, বাড়ী ফেরবার পথ আপনার খোলা নেই; তবে আপনি যদি আমার সঙ্গে আসেন, তা হ'লে আমি আনন্দের——।'···সেই নিঃসহায় অবস্থায় মানুষ খুনী আসামীর গলা জড়িয়ে ধরতেও পারে; আমিও না বলতে পারিনি। অবিশ্বাস যে মনে একটুও জাগেনি অজয়দা, সে কথা বলব না; কিন্তু আমার কাছে তখন বিশ্বাস অবিশ্বাসের একদর।

—তুমি গেলে তাঁর সঙ্গে?—উঠে বসে জিজ্ঞাসা করি।

—গেলাম, কিন্তু সে তাঁর নিজের বাড়ী নয়; আজ আমি যা, সেখানে যারা থাকৃত, তারাও তাই। গিয়ে বুঝলুম যে, প্রতুলের

সঙ্গে তাঁর এ বিষয়ে রীতিমত কথাবার্ত্তা হয়েছিল। প্রতুল নিজে যে ভার বইতে পারেনি, সেটা সে তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েচে।...এর পর বলবার মতো নতুন কিছুই নেই। আস্তে আস্তে তলিয়ে গেলুম! গাইতে শিখলুম, বাজাতে শিখলুম; কলকাতার সমাজ বিশেষে আমি আজ সকলের উত্তেজনা!—হাসবার চেষ্টা ক'রে উষা থাম্‌ল।

—যিনি তোমায় নিয়ে গিয়েছিলেন?

—তিনি ও বছর খানেক আগে সরে গেছেন।

—কিন্তু তুমি বাড়ীতে ফিরে এলে না কেন উষা, কেন তুমি এমন ক'রে নিজেকে হত্যা করলে?

—হত্যা?—তা হবে। কিন্তু ফিরে গেলেই কি আমার নামে ধন্য ধন্য পড়ে যেত অজয়দা!—ঠাঁই দিতই বা কে?

—রামবাবু দিতেন উষা, তোমার জন্যে তিনি বোধ করি সমাজ ছাড়তে পিছিয়ে যেতেন না।

—হয়ত' যেতেন না, কিন্তু পিসি সেই দিনই আত্মহত্যা করতেন। তাঁকে বাঁচতে দিয়ে আমিই না হয় মলাম; তা'তে সমাজের কি আসে যায়?

উষার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে চোখ দুটো জ্বালা করে; ক্ষিদে তেষ্টা একেবারেই মনে নেই। বৃষ্টি থেমে গেছে কখন তা' টের পাইনি। বন-শ্রেণীর ওপারে, মেঘের রাশ ঠেলে কৃষ্ণপক্ষের খণ্ড চাঁদ দেখা দিয়েছে,—কত দূরে, অথচ কত কাছে। চোখ বুজে ও-কে মনে মনে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করি; কত কাছে থেকেও

ও আজ কতদূরে, কত একা ! মানুষে মানুষে কেন এত বিরোধ, তা'দের মাঝখানে এত গ্লানি আসে কোথা থেকে,—অনর্থক এতখানি ব্যবধান !

স্তব্ধতা ঘুচিয়ে উষা বললে,—নিজের কথাই বললুম এতক্ষণ ধ'রে। তুমি কোথায় এসেছিলে কিছুই ত' শোনা হ'ল না।

—এসেছিলুম জেলে, উপস্থিত ছাড়া পেয়ে বাড়ী চলেছি।

উষার দু'চোখে কী অপার বিস্ময় !

বললে,—জেলে গিয়েছিলে, কেন ?

বললাম,—দেশের কাজে। কিন্তু বলেই এল হাসি ! দেশকে গড়তে চাইছি, ওদিকে মানুষের মধ্যে যে ভাঙন ধরে গেছে, তাকে জোড়া দেবে কে ? রাজনীতি নিয়ে এত গণ্ডগোল, এত চীৎকার, কিন্তু আমাদের ঘরে যে আলো এলনা আজও, বাইরের সংস্কার নিয়ে কি হবে? কে বলবে এদেশের সমাজ-সমস্যা বড়, না রাজনৈতিক সমস্যা বড় ? রামবাবু একদিন উষার আবার বিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখেছিলেন ; সে বিয়েতে ও সুখী হ'ত কি না জানিনা, কিন্তু পাপে তার গলা পর্য্যন্ত আজ ডুবে যেত না। উষাকে আজ এই জঞ্জাল থেকে টেনে তোলবার পথ খোলা নেই, দেশের জন্যেও না, মানুষের দোহাই দিয়েও না।

হঠাৎ বললুম,—উষা, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

—কোথায় ? কেন ?

—আমার বাড়ীতে ; সেই খানেই তুমি থাকবে।

উষা প্রচণ্ড শব্দ ক'রে হাসলে, ভাবলে যেন ঠাট্টা করেছি।

—তোমার বোধ হয় মাথার ঠিক নেই অজয়দা, জেলে বসে বসে। সেখানে গেলে সেবা অবধি যে আমায় দেখে হাস্‌বে, কথা পর্য্যন্ত কইবে না।

—তা' হোক্, তার ব্যবস্থা আমি করব।

ঊষা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। কি ভাবে কে জানে। মুখ দেখে ও-র মনের ভাব বোঝা অসম্ভব।

একটু পরে বললে,—আচ্ছা যাব। কিন্তু তার আগে তোমায় যেতে হবে আমার ওখানে। সেখানকার একটা ব্যবস্থা না ক'রে নড়বার উপায় আমার নেই।

ঊষার ঘরখানি কেবল বিলাসের অসংখ্য উপাদানে সাজান নয়, পরিচ্ছন্ন। ঘরে ঢুকতেই একটী ছোট টিপয়ের উপর রাখা একখানি ছবি। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ও ছবিখানি ঊষার কাছে থাকতে পারে, তা' আমি আগে জানতাম না।

ঊষাকে বললাম,—এ ছবি তুমি পেলে কোথায়?

—এনেছিলুম সঙ্গে ক'রে।

আমাকে ঘরের মধ্যে একা ফেলে রেখে ঊষা হাওয়ার মতো ঘর থেকে চলে যায়। চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখি—বড় বড় আয়না, কোণে একটা পিয়ানো, বুক-কেস্, নানা রকমের

ছবি, টেলিফোন—আ[redacted]ও কত! এর মাঝখানে আমারও যে একখানা ছবি দেখতে পাব, সে কথা কে জানত'?

উষা যখন আবার ঘরে ঢুকল, তখন প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেছে এবং ইতিমধ্যে সে স্নান সেরে ফেলেছে। চওড়া রেশম-পাড় শাড়ীর উপর ভিজে চুলগুলি পড়েছে লুটিয়ে, মুখে অপরূপ একটি কমনীয়তা। কে বলবে, আমাদের সেই উষা নয়?

ঘরে পা দিয়েই বললে,—তুমি বোধ হয় রেগে উঠেচ অজয়দা? সত্যি ভারি দেরী হ'য়ে গেল। কিন্তু এ রকম ক'রে বসে থাকলে হবে না। ক্ষিদে তোমার পেয়েচে নিশ্চয়ই। চট্ করে স্নানটা সেরে নাও।

স্নান করবার ইচ্ছে মোটেই ছিল না। বললাম,—তোমার ইচ্ছেটা কি?

উষা অত্যন্ত মিষ্টি ক'রে হাসল। বললে,—বিশেষ কিছু না। আমার গোছ-গাছ ক'রে নিতে বোধ হয় রাত্তির হ'য়ে যাবে। স্নান সেরে একটু জিরিয়ে নাও। তোমার একলা যদি কল্‌তলায় যেতে লজ্জা হয়, তা' হ'লে বলো চাকরটাকে দাঁড়াতে বলি।

উষার আগ্রহের কাছে কোন আপত্তিই টিক্‌ল না। ফিরে এসে দেখলাম, ষ্টোভ জ্বেলে উষা হালুয়া ক'রে ফেলেছে এবং কেটলীতে চায়ের জল ফুটচে!

বললুম,—এসব কি?···সত্যি—

—সত্যি, তোমার ক্ষিদে পেয়েছে, তা' আমি জানি। আপাততঃ এই খেয়েই থাক; তারপর দুপুরে কি করতে পারি, দেখা যাবে।

এমনি ভাবে প্রতি মুহূর্ত্তেই উষা আমাকে আশ্চর্য্য করে, কিছুতেই ও-কে বুঝতে পারিনে।

বললাম,—ভাত আমি বাড়ী গিয়েই খাব, মিথ্যে তুমি কষ্ট ক'র না।

—কেন,এখানে খেলে জাত যাবার ভয় রাখ নাকি অজয়দা'?

—কথাটা ঠিক তা' নয়, তবে তোমাকে কষ্ট দেবার কোন দরকার দেখি না; যখন বাড়ী এত কাছে—

—বাড়ী ত' আছেই অজয়দা,—চিরকাল থাকবে; খাবেও চিরকাল সেইখানেই। একদিন না হয় আমার জন্যে বাড়ীর ভাতের মোহ ছাড়লে।

বললাম,—বাড়ীর ভাতের মোহ না হয় ছাড়তে পারি উষা, কিন্তু সেখানকার স্নেহের মোহ যে আরও কঠিন!

উষা হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে,—তা বটে!

কিন্তু ও-র মুখে অস্পষ্ট একটা ছায়া এসে পড়ে, তা বুঝতে পারি। হয়ত' ও আঘাত পেয়েছে। কিন্তু আঘাত করবার ইচ্ছে আমার ছিল না,—সত্যিই ছিল না।

অন্যমনস্কের মতো বসে বসে উষা চায়ের পেয়ালায় চাম্‌চে দিয়ে ঠুন্‌ঠান্ শব্দ করে। ওদিকে কেৎলীর জল উথলে উঠে ষ্টোভ নিবিয়ে দিয়েছে—সেদিকে খেয়ালই নেই! হঠাৎ সেদিকে নজর পড়ে যেতেই, যেন ঘুম থেকে উঠে বললে,—তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ—আশ্চর্য্য মানুষ যা'হোক! নাও, চট্ করে চুলটা আঁচড়ে, ডিস্‌টা টেনে নিয়ে বসে পড়; আমি চা ঢেলে ফেল্‌ছি।

কিছুই না—হয়ত' সামান্য শিষ্টতা, মানুষের প্রতি মানুষের সহজ ব্যবহারের তুচ্ছ একটু পরিচয়। তবু উষার সেই ঘর-কন্নার ভাবটুকু আমার ভারি ভাল লাগে। ভাবছিলাম, প্রতুল ও-র যে গৃহ-নীড়ের স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে গেছে, উষার সমস্ত মন হয়ত' তারই জন্যে এই বিলাস-যজ্ঞের মাঝখানে থেকে থেকে কেঁদে ওঠে ; ও-র পথ-হারাণো জীবনে দু'জনের নিজস্ব একটি ঘরের প্রয়োজন বুঝি আজও আছে। কিন্তু মানুষ ও-কে তা' আর দেবে না!

ঘরের জিনিষ-পত্র গোছ-গাছ হ'তে লাগল।

বললে,—এত জিনিস-পত্তর কোথায় রাখবে অজয়দা?

—ব্যবস্থা একটা হবেই, তার জন্যে চিন্তা নেই।

সারারাত্রি ট্রেণে কাটিয়ে, স্নানের পর সমস্ত শরীর এবং মন যেন অবসাদে নুয়ে পড়েচে। উষার দেরাজের ওপর একটা গানের বই। সেখানা নিয়েই দেখতে লাগলুম। বাইরে থেকে আর সব মেয়েদের গলা শুনতে পাওয়া যায়—মাঝে মাঝে বেতাল হাসি। ওপাশের ঘরের একটি মেয়ে চাকরকে মাছ আনতে দিয়েছিল, কিন্তু সে তার বদলে সিগারেট নিয়ে এসেছে,—তাই নিয়ে সমস্ত বাড়ীটায় উত্তেজনা পড়ে গেছে!

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম, ঘণ্টা তিনেক কেটে গেছে ; কিন্তু উষার দেখা নেই। কোথায় গিয়ে বসে আছে? অদ্ভুত মেয়ে!

অস্বস্তিতে সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হ'য়ে উঠছিল। উষা একেবারে ভাতের থালা নিয়ে হাজির। আমায় কথা বলার অবসর না দিয়ে, আসন পেতে মাটীতে জল ছড়িয়ে ঠাঁই করে ফেললে।

আশ্চর্য্য হ'য়ে খানিকটা চেয়ে থেকে বললাম,—আমার ক্ষুধা সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান যে আমার চেয়ে বেশী ঊষা!—এত আমি খাব কি করে?

ঊষা বললে,—ক্ষিদে না থাকে, একটীবার বসে, উঠে চলে যাও; আমি কিছু মনে করব না।

—কিন্তু তার জন্যে এত আয়োজন করবার দরকার হয় না ঊষা! এ কেবল অপচয়।

—তা হবে। খাওয়ানর অপচয় সম্বন্ধে তোমার ধারণা বোধ হয় মেয়ে মানুষের চেয়ে বেশী নয়।...কিন্তু তর্ক থাক, বসে পড়।

কিন্তু বসে পড়বার পর ঊষা যখন হাত-পাখা নিয়ে হাওয়া আরম্ভ করে দিলে, তখন সত্যিই সঙ্কোচ বোধ করতে লাগলাম। চারিদিকের রাশীকৃত আয়োজনের দিকে তাকিয়ে বললাম,—ম্যাজিক না জানলে এইটুকু সময়ের মধ্যে এ সব হয় না ঊষা!

—ও জিনিষটা আমাদের একটু শিখতে হয় অজয়দা! নইলে এত শিগগির এ রকম হলুম কি ক'রে?

ঊষার কোন কথাই ভাল বুঝতে পারিনে। জীবনটাকেই কেবল সে রহস্যময় ক'রে তোলেনি, মুখের কথাকেও।

খাওয়া শেষ হ'লে ঊষা নিজের হাতে দু'টী পান সাজলে আমার সামনে বসে বসে। পান দু'টী দিয়ে বিছানাটা পরিষ্কার ক'রে, ধোয়া একখানি চাদর বিছিয়ে দিয়ে বললে,—এইবার লক্ষ্মী ছেলেটীর মতো শুয়ে পড়; আমি খেতে চললুম। জেগে থেক না, ঘুমিয়ে নাও একটু। বিকেলের আগে যাওয়া আমার হবে না।

ঘরের জানালাগুলি বন্ধ করে দিয়ে উষা চলে গেল। ঘুমের জন্যে চোখ বহুক্ষণ থেকেই পিপাসিত হয়েছিল, উষার সে সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেবার আবশ্যকতা ছিল না। সেই [redacted]কার ঘরের মধ্যে দেখতে দেখতে কখন যে চোখের পাতায় [redacted] নেমে এল, তা' বুঝতেও পারিনি। যখন আবার চোখ মেলে চাইলাম তখন পাঁচটা বেজে গেছে। ঘরে আমি যে বিছানাটার ওপর শুয়েছিলুম, তা ছাড়া আর কোন কিছুই নেই।

তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। বোধ হয় গাড়ী ডাকিয়ে উষা জিনিষ-পত্তর তুলে ফেলেছে। এতক্ষণ ঘুমনর জন্যে ভারি লজ্জিত বোধ করছিলুম। কিন্তু উষার সাড়া শব্দ নেই, তার চাকরটাকেও দেখতে পাওয়া গেল না!

ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরের মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করি,—উষা কোথায়, তাকে একবার ডেকে দেবেন?

মেয়েটী বেশ স্বাভাবিক গলায় জবাব দিল,—উষা চলে গেছে এখান থেকে; এ বাড়ী সে ছেড়ে দিয়েছে।

চোখের সাম্‌নে মাটি হয়ত ক্ষণকালের জন্যে দুলে উঠেছিল! নিজেকে সংযত করে বললুম,—কোথায় গেল জানেন?

মেয়েটি একটু হেসে জবাব দিলে,—তা সে কাউকে জানায়নি। চিরকালই ও এম্‌নিই কিনা—কখন কি খেয়াল ধরে, কেউ জানতে পারে না।

— ঘরের ভাড়া—

—তাও মিটিয়ে দিয়ে গেছে।

কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, ঊষা আমার সঙ্গে এম্‌নি প্রতারণা করে পালিয়ে গেছে এবং কোথায় গেছে তা' জানবার পথ পর্যান্ত রেখে যায়নি। তবে কি প্রয়োজন ছিল ও-র এতটা আত্মীয়তার, এতখানি সৌজন্যের ?—নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মেয়েটী বললে,—একখানা চিঠি সে রেখে গেছে আপনার জন্যে ; ঘরেতেই আছে—বালিসের নীচে।

চিঠিখানি পড়লাম।—

'অজয়দা, এর আগে যেদিন বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছিলাম সেদিনও চিঠি লিখেছিলাম ; আজও চিঠি লিখেই বিদায় নিলুম। মিথ্যা কথা বলে তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে এসেছি, প্রথমে তার জন্যে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখি। নইলে আসতে না।

'এম্‌নি ক'রে না গিয়ে আমার উপায় ছিল না। আমাকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে গেলে আমার বিড়ম্বনা কতখানি হ'ত জানি না, কিন্তু তার চেয়ে দুর্ভোগ হ'ত তোমার। আমার মতো এক মেয়ের জন্যে তোমাকে লোকের উপহাস, পরিহাস কুড়োতে হবে—তা' আমি আমার অতি বড় সৌভাগ্যের বিনিময়েও কল্পনা করতে পারি না। তোমার সামনে কত কাজ, কত লোক তোমার দিকে চেয়ে আছে। আমার জন্যে কেন তুমি নিজেকে নষ্ট করবে ?

"কোথায় গেলাম তা' যে এ বাড়ীতে কেউ জানে না তা নয়, আমি তাদের বলতে বারণ ক'রে গেলাম—যাতে তুমি আমার সন্ধান না পাও। তোমার সঙ্গে যেতে পারলুম না, এ কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে ; কিন্তু তার চেয়ে বেশী মনে থাকবে

এই কথা যে, আমার হাতের ছোঁয়া খেতে তুমি ঘৃণা বোধ করনি ; জীবনে একটি দিন আমি একজনকে নিজের মনের মতো করে খাওয়াতে পেরেছি। মেয়ে মানুষের জীবনে এত বড় সৌভাগ্য খুব কমই আসে অজয়দা !

'বিয়ে তোমাকে করতেই হবে এবং তা করবেও। তারপর কোনদিন একটি মেয়ের সাম্‌নে বসে ভাতের থালা নিয়ে যদি আজকের দিনটিকে মনে করতে পার, তা হ'লে তার চেয়ে বড় কিছু আমার চাই না ; আমার সব দুঃখ তার কাছে ছোট হয়ে যাবে।

'মাকে প্রণাম দিও ; সেবাকে ভালবাসা—আশীর্ব্বাদ করতে আমার নেই।...আর তুমি আমার জন্যে আজ যে ক্ষতি স্বীকার করতে চেয়েছিলে, তার জন্যে কি করে তোমায় ধন্যবাদ দেব তা আমার জানা নেই। তুমি শুধু আমায় ক্ষমা করবার চেষ্টা ক'র।'

চিঠিটা পকেটে ফেলে, সিঁড়ি পার হ'য়ে নীচে নেমে এলাম। আকাশের দিকে চেয়ে মনে হ'ল, সামান্য ক'ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীতে যেন প্রকাণ্ড ভূমিকম্প হ'য়ে গেছে !

জেলখানায় কয়েদীর খুপরীর স্বল্পালোকিত ঘরটীতে বসে হঠাৎ কেন জানি না, এই পৃথিবীর প্রতি প্রাণীর জন্যে দার্শনিক-ভাবে দুঃখ অনুভব করতাম। ছোট একটি জানালা, তার ভেতর দিয়ে বাইরের বিশাল জগতের ক্ষুদ্র একটু অংশ দেখা যেত— তার ঋতুর পরিবর্ত্তন, বসন্তের পরিপূর্ণ সমারোহের একটি সুস্পষ্ট আলোক। অদূর প্রান্তর হ'তে অবিরাম কেয়াফুলের গন্ধ ভেসে আসত। বন্দীর নিকট মনে হ'ত, মাটীর প্রতি রেণুটীতে বুঝি আনন্দের শিহরণ লেগেচে; তৃণে তৃণে যেন পুলকের আগুন! উৎসব-দিনের সন্ধ্যায় অবরুদ্ধ মানুষগুলি হাওয়ায় উড়ে আসা অস্ফুট কয়েকটী উল্লাসের রেশ শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হ'য়ে থাকত।

ধরিত্রীর এই সমারোহের কথা মনে ক'রে ভাবতাম, যে মাটি আমাদের জন্ম দিয়েছে, লালন করেছে—যে আমাদের চিরনিদ্রার সহচরী, সে আমাদের অপার দুঃখের সন্ধান জানে না!

ছোট জানালাটী দিয়ে নীল আকাশে লঘু সাদা মেঘের চঞ্চল কৌতুকে যাওয়া-আসা, শুক্লা সন্ধ্যার রূপালি আলো আর অমা-রজনীর সুসজ্জিত আকাশের দিকে চেয়ে থাকতাম। ভাবতাম, এই আকাশ,—যার বিস্তীর্ণ পরিব্যাপ্তির তলায় প্রতিদিন মানবের কত অজস্র হাহাকার,—দুঃখ জমে ওঠে, তার সঠিক সন্ধান সেই আকাশও রাখে না।

মাটি আমাদের দুঃখ জানে না, আকাশও নয়। ঈশ্বরের সৃষ্টির ভেতর মানুষ সবচেয়ে একা!

সত্যিই হয়ত' মানুষ সব চেয়ে একা। জীবনে যাদের কোন স্বপ্নই সত্য হ'ল না, যাদের প্রেম নয় স্থায়ী, যাদের কাছে উল্লাস শুধু উঁকি দিয়ে উড়ে যায়, তাদের চেয়ে অসহায় দুর্ভাগা আর কা'কে বলব? আমাকে প্রবঞ্চনা করে ঊষার চলে যাওয়ার ভিতর কতখানি স্বার্থত্যাগ, কতটুকু মহত্ব ছিল তা' উপলব্ধি করবার পূর্ব্বেই অভিমানে নিজেকে অবসন্ন ক'রে তুলেছিলাম।

ঊষার ঘর থেকে বেরিয়ে যখন নগরের কোলাহলের মুখোমুখী এসে দাঁড়ালাম, তখন মনে হল, আমি যেন সেই অজয় আর নেই—যার পরিচিত লোকের সংখ্যা এককালে খুব কম ছিল না। হঠাৎ মনে হল আমার এক বৎসরের অন্তরীণের সুযোগে পৃথিবীর পুরাণো স্বভাব পরিবর্ত্তন হয়েছে; পথ, বাড়ী মানুষ কেউ আর

সেদিনের নয়, তারা কেউ আমাকে চেনে না। আমিও কি তাদের চিনি? সন্ধ্যা হয়েছে, অবসন্নভাবে পথ চলতে চলতে ভাবতে লাগলাম, কোথায় যাওয়া যায়?

জেলে থাকতেই সংবাদ পেয়েছিলাম, সেবার বিয়ের কাজ সমাধা হ'লে, মা কাশীবাস করতে চলে গেছেন। মার কাছ থেকে কয়েকখানা চিঠি পেয়েছিলাম; চিঠি এসেছিল কাশী থেকে। তিনি লিখেছিলেন, জেল থেকে মুক্তি পাবার আগে সংবাদ দিও, তা হ'লে আমি কাশী থেকে ফিরে যাব। মা'র চিঠিতে জেনেছিলাম, পুরাণো চাকরটার হাতে কলিকাতার বাড়ীর সমস্ত ভার দেওয়া হয়েছে; চাবি ইত্যাদি সব তারি কাছে।

হঠাৎ আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। গাড়ী-ভাড়া ছাড়া অর্থ-সম্বল বিশেষ কিছু ছিল না। সুতরাং কাশীতে মাকে ও বাংলার এক সুদূর পল্লীতে সেবাকে আমার হঠাৎ মুক্তি পাওয়ার সুসংবাদ জানানো সম্ভবপর হয়নি। অথচ জানি, ওই দুটি মমতাময়ী নারী-হৃদয় আমার মুক্তির জন্যে, আমার মঙ্গলের জন্যে মনে মনে কী ব্যাকুল প্রার্থনাই না করেচে!

বাড়ীর দিকেই অগ্রসর হওয়া গেল। নিজেকে এতখানি অসহায় ভাববার অবকাশ জীবনে পূর্ব্বে কোন দিন পাইনি। বাড়ীর পথে চল্‌তে চল্‌তে কেবলি মনে হ'তে লাগল, এখন যেন একটী পরিচিত লোকের কুশল-আহ্বান আমাকে অভিনন্দিত করে। হয়ত' তার সঙ্গে আমার বেশী পরিচয় নেই, হয়ত' সে লোকটী উষাকে চেনে না। কিংবা ন* বনিতা উষাকে সে

হয়ত' চিনলেও চিন্‌তে পারে। যাই হোক, তাকে ঘনিষ্ঠভাবে আলিঙ্গন করে হয়ত বলতাম, অনেক দিন তোমায় দেখিনি ভাই, তুমি অনেক বদলে গেছ। আর দেখবই বা কি করে? এই ত' কতদিন পরে জেল থেকে খালাস পেয়ে আসছি। পথে উষার সঙ্গে দেখা—আমাদের বাড়ীর ভাড়াটে রামবাবুর মেয়ে উষা। সে আমায় বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কত যত্ন করলে—

কিন্তু তারপর?—তারপর কত কথাই বলা চলে। কিন্তু উষার সত্যকার পরিচয় তাকে আমি জানাই কি ক'রে? অগত্যা সেই বিস্মিত লোকটীকে কোন প্রশ্ন করতে না দিয়ে বলতাম, তবে আসি, নমস্কার, আর একদিন দেখা হবে, আজকে আমি ভয়ানক ক্লান্ত।

সমস্ত মনটাতে যেন ঝড়ের পরের অবগাঢ় শ্রান্তি! মনে হতে লাগল জীবনের তীব্রতা হারিয়ে ফেলেছি; আমি যে সেই অজয়, যার মনে প্রাণে একদা স্বাদেশিকতার উৎসাহ উত্তল হ'য়ে উঠেছিল, তা আমারও কাছে কোন বিস্মৃত অতীতের অন্ধকার আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছে। সব চেয়ে ব্যথা বোধ করতে লাগলাম এই ভেবে যে, এমনি ভাবে, এমনি ক্লান্ত, নিরুৎসাহ পঙ্গু জীবন নিয়ে পৃথিবীতে আমার বেঁচে থাকার দরকার আছে। ভাবনা-উৎকণ্ঠিত মনের দুয়ারে কে যেন কত কী অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের ভেরী বাজিয়ে দিয়ে গেল—অমঙ্গলের অভিশাপ।

চলতে চলতে কি যে ভেবেছি ও কি যে ভাবিনি, তার গ্রন্থিবদ্ধ কোন ব্যাখ্যা নিজেকে জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর পাবার কোন

সম্ভাবনাই ছিল না। স্বপ্নাবিষ্ট মানুষের মতো পথভ্রষ্ট না হয়েও বাড়ী এসে পৌঁছলাম।

বাড়ীর তত্ত্বাবধানে যে পুরাণো চাকরটী ছিল, তাকে কোন প্রশ্ন করবার উৎসাহ ছিল না। সে আমার আহারের ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়ে উঠল। সমস্ত বাড়ীটাকে আবার এক বৎসর পরে কেমন নতুন মনে হতে লাগল। পরিচিত গ্রামে যেন দীর্ঘকাল পরে সন্ধ্যার অনতিগাঢ় জ্যোৎস্নায় দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসে পৌঁছলাম—যে গ্রামের অপরিসর জীবনের মাঝখানে শৈশবের স্মৃতি মনে মনোরম হয়ে আছে।

নিস্তব্ধ বাড়ীটির মধ্যে ভূতের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। রাত্রির সহরের কলরোল শোনা যাচ্ছে, লক্ষ জীবনের স্পন্দন-দুঃখ, বেদনা-উল্লাস ও গতির কল কোলাহল। রামবাবুরা যে অংশটীতে থাকতেন সেখানটিতে যেন একটা সকরুণ বিষণ্ণতা! তাঁর স্নেহ-পরায়ণ ব্যথিত আত্মা যেন সেই বাড়ীটার সর্ব্বাঙ্গে কাতরতা মাখিয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু উষা আর ফিরবে না।

মনে মনে ভাবলাম, জীবনে অনেক আশাই আমাদের কখনো কবিতা হ'য়ে ওঠে না। ছন্দ-পতন, মিলের গরমিল তার প্রতি পদে, ভাবও থেকে যায় অস্ফুট। কিন্তু তবুও যখন সেই আশাটিকে ছেড়ে যেতে হয়, তখন মনে করি যে, যে কবিতা হঠাৎ হারিয়ে গেছে তার শোকের মতো কি একটি অনবদ্য বিষণ্ণতা গভীর আবেগে আমাদের মুহ্যমান ক'রে রেখে যায়—যে শোকটিকে ভুলতে গেলেও নতুন করে বেদনা লাগে।

যখন উষাকে আমার অজ্ঞাতসারে অমনভাবে চলে যেতে হল, তখন আমার উগ্র অভিমানের মাঝখানেও নিজেকে আশ্বাস দিয়ে ভুলাতে চেয়েছিলুম যে, উষাকে আমার ভুলে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল প্রথম থেকেই। .কে জানত যে, উষার জীবনে প্রতুলের আবির্ভাব না হ'লে একদিন হয়ত আমিই প্রতুলের মতো প্রবৃত্তি নিয়ে তাকে কামনা করতাম না! যে মানুষ নিজেকে বিশ্বাস করে, তার চেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র, মহৎ হয়ত আর কোন রূপেই হওয়া যেতে পারে না; তবু তাকে নির্ব্বোধ ও আত্মপ্রবঞ্চক হ'য়ে নিজের মধ্যে প্রতি মুহূর্ত্ত বিব্রত থাকতে হয়।

বহুদিন পরে উষার সাক্ষাৎ পেয়ে হঠাৎ আবার সেই বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধের স্মৃতি ঝড়ের মতো আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলল। সেই দিকেই দৃষ্টি শুধু বার বার ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগল, যে-যে স্থান গুলিতে উষা এক একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীতে দাঁড়াত। বারবার উষার কিশোর দিনের কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পেলাম। তার তুচ্ছতম প্রশ্নগুলি, তার অস্ফুট হাসি, ছোট ছোট মৃদু কথা, তার অনাবশ্যক গাম্ভীর্য্য সব আমার কল্পনার সামনে ভীড় করে দাঁড়াল। তাদের উপেক্ষা করা চলে না, অস্বীকারও নয়। রহস্যের আবরণ গেল ছিঁড়ে, সুপ্তি গেল ভেঙে। বুঝি কুয়াসার আড়ালে দুটি পান্থ আমরা অদেখা পরিচয়ে ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরকে চিনবার ইচ্ছায় আলোর অপেক্ষায় চলেছিলুম, কিন্তু আলো যখন ফুটল তখন আমরা দু'জনে চলে গিয়েছি দুটী পথে,

ব্যবধানের দূরত্ব আমাদের চেনবার ইসারাকে চিনতে দিল না। ঊষা ফেরবার ভরসা করেনি; মিলনের আশায় আমার অশান্তি কামনা করতে পারল না—এই কি তার সবচেয়ে বড় অপরাধ? হতভাগিনী ঊষা! কলঙ্কিনী ঊষা! ক্ষণিক মিলনের চেয়ে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ মধুর।

ঊষার প্রতি অভিমান গেলুম ভুলে। কি যেন একটি অব্যক্ত আনন্দ হ'ল এবং তাকে ছাপিয়ে উঠল গভীর দুঃখ। আমরা পরস্পরকে এতদিন ধরে ভালবেসে এসেছি, সে কথা চুপিচুপি ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল আমার বৃহৎ অভিজ্ঞতা লাভ করবার চেষ্টাকে আড়াল করে দাঁড়াবার ভয়ে ঊষা আসেনি, কোনদিন আসবে না। সে যে আর আসবে না, তার দুঃখকেও সে ভুলে যেতে বলে গেছে বিয়ে করে। ভাবলাম, তার ব্যর্থ জীবনের জন্যে বিধাতার নিকট আমি কি নিবেদনই বা পাঠাতে পারি? কোন আশীর্ব্বাদও তার জন্যে মনে পড়ে না।

সে রাত্রে ঊষাকে ছেড়ে আমার চিন্তা আর কোন দিকে অগ্রসর হতে পারেনি। সকাল বেলা নিজের মনকে অনেকখানি গুছিয়ে নিলাম। ঠিক করা গেল মাকে ও সেবাকে সংবাদ দিতে হবে। তাদের খবর দেওয়ার কথায় মনে পড়ে গেল আশ্রমের কথা। কি জানি সেখানে সকলে কেমন আছে! কতদিন তাদের দেখিনি—লক্ষ্মীকে, সাকিনাকে। কে জানে ছন্নছাড়া অশান্তও আবার কোথায় আশ্রয় নিয়েছে! ও-দের কথা ভাবতে গিয়ে কেমন যেন ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। মনে হল

তারা যেন আর বেঁচে নেই, তাদের ছুটি নিতে হয়েছে,—সন্ধ্যার ম্লানায়মান আঁধারে তারা বুঝি সকলেই নিঃশব্দে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে বিদায় নিয়েছে। ও-দের পরিশ্রমের জন্যে কেউ কৃতজ্ঞতা জানায় নি, কেউ সম্ভ্রম দিল না। সত্যাশ্রয়ীদের বিপন্ন হয়ে চলে যেতে হয়েছে।

সত্যই, মানুষের শক্তির অপব্যয়, মানুষের মনের না-বোঝার অভিমান, প্রতিদিন পৃথিবীর কত ঘটনায় গতি দেয়, ঘুরিয়ে ফেলে; কত বৃহৎ সত্যের সূর্য্যোদয় মেঘে মেঘে পড়ে যায় ঢাকা। প্রলয়ের বাতাস শুধু অরণ্যেই আন্দোলন তোলে না, মানুষের জীবনের উপরে ধ্বংসের নৃত্যেও সব বিপর্য্যস্ত করে যায়।

দেখতে দেখতে হঠাৎ টেবিলের উপর একখানি খামের চিঠি আমার নজরে পড়ল। আশ্চর্য্য হয়ে খুলে দেখি, চিঠিখানি সাকিনার। লিখেছে চট্টগ্রাম থেকে—আট মাস পূর্ব্বের একটি তারিখ। সাকিনা লিখেছে,—'অজয়বাবু, বিদায় আপনাদের সকলের কাছে। আপনাদের কাছে আমার মৃত্যু হল বটে কিন্তু আবার নব-জীবনের সন্ধানে ছুটলাম। ভুল হল কিনা কে জানে? তবু ক্ষতি কি আমাদের পরিমিত পরমায়ুর শেষ পর্য্যন্ত একটানা পথে না চলে। বিয়ে করেছি—আলি আকবর আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গী। স্বামী-পুত্র নিয়ে একটি পরিপূর্ণ নিবিড় সংসার ছাড়া মেয়েদের জীবনে আর বড় কি প্রার্থনা থাকতে পারে?

"আশ্রম ভেঙে গেছে। আপনি জেলে যাওয়ার পর আশ্রমের উপর পুলিশের নজর পড়েছিল। গরীব রুগ্ন লোকেরা রোগের চেয়ে পুলিশের হাঙ্গামাকে ভয় করে বেশী। সেই জন্যে তাদের সেবার সৌভাগ্য আমাদের হল না। লক্ষ্মী কোথায় যে চলে গেছে জানি না; তার খোঁজ আপনি নেবেন। যে ক'দিন তার সঙ্গে আমাকে থাকতে হয়েছে, তার ভেতর আমি তাকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছি, ভালবেসেছি। ও-কে যে আমি কি নিবিড় করে চিন্‌লাম, সে শুধু আমিই জানি। ও-র নীরব তপস্যাকে আপনার বন্ধু অশান্ত মর্যাদা দিতে পারেনি। আজ নব-জীবনের তীরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীকে আমি প্রণাম পাঠাই।

"এইবার আপনার বন্ধু অশান্তের কথা। অশান্তের জন্যে আমি কতখানি অনুভব করেছিলাম তা' হয়ত' আপনার জানা আছে। আলি আকবরকে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গী নির্ব্বাচন করে যদি আমি কোনও ভুল, কোনও অপরাধ করে থাকি, তার জন্যে একমাত্র দায়ী হচ্ছে আপনার বন্ধু। আশ্রম ভেঙে যাওয়ার পর তার কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলাম। তাতে লিখেছিল,—আশ্রমকে বাঁচাতে পারা গেল না, তার জন্যে দুঃখ করবার কিছুই নেই; কারণ ঐ অনুষ্ঠানটী আমার বৃহত্তর প্রচেষ্টার পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আশ্রমের এমনি নির্ব্বাণই বোধ হয় মনে মনে আমি চেয়েছিলাম। অজয় জেলে গেছে, কিন্তু ফিরে এলে তাকে জানিও—এ পথ তার জন্য নয়। তাকে আমার অনুরোধ—সে যেন বিবাহ ক'রে নির্ব্বিকার জীবন যাপন

করে ; কারণ ভারত-উদ্ধারের নাম করে যারা জেলে যায় তারাই হচ্ছে সব চেয়ে নিরীহ, কিন্তু ফাঁকী-দেওয়া যশের প্রার্থী। সাকিনা, তোমার কাছ থেকে এই চিঠিতে শেষ বিদায় চেয়ে নিচ্ছি। তোমার প্রেম আমাকে যেন কি এক কঠিন দায়ীত্বে আটকে রেখেছে, আমার উদ্যমকে যেন কোমল করে দিচ্ছে। সুতরাং বিদায় সাকিনা! এ জীবনে তোমার সামনে আর আসতে পারব না। তার জন্যে নিজেকে অসুখী করে রেখো না।—

"এই আপনার বন্ধুর চিঠি—আপনার কাপুরুষ বন্ধুর, দুর্ব্বল বন্ধুর আমার কাছে শেষ প্রেম-পত্র! আপনারা তাকে অসম-সাহসিক বলেন, আমি কিন্তু এখন তাকে সব চেয়ে ভীরু বলে ঘৃণা করি। আপনার বন্ধু কি করে ভাবতে পারল জানি না যে, তার মতো একটি দুর্ব্বলচিত্ত লোক, যার কাছে নারী জীবনের কর্ম্মসঙ্গিনী নয়, যার কাছে নারীর প্রেম ব্রতের অন্তরায়, আমি যার কাছে শুধু মানসিক বিকার ও দৈহিক বাধা, তাকে পেলাম না বলে আমাকে আজীবন শোক করে কাটাতে হবে? আপনার বন্ধুটি হয়ত ভাবতে পারেনি যে, বাঙালী সাকিনা সোফিয়ার চেয়ে যে কোন দিকে কম নয়।

"এত বড় অপমানকে ক্ষমা করবার মতো ন্যাকা মেয়ে আর যত জনই থাক, আমি নই। সেই জন্যেই বিবাহ করলাম। আপনি মনে করে ক্ষুণ্ণ হতে পারেন যে, বিয়েই যদি করলাম, তবে আলি আকবরকেই কেন বরণ করলাম? কিন্তু আলি আকবর আর সে আলি আকবর নেই। তার আশ্চর্য্য

পরিবর্ত্তন ঘটেছে—প্রেম তাকে মানুষ করেছে; তার চেয়ে নিঃস্বার্থ স্বদেশভক্ত আমি আর জানি না। আমি তার মনুষ্যত্বকে অভিনন্দন করেছি। আপনাদের চোখে অশান্ত যদি একটি মহান্ মনুষ্যত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়, তা হলে আলি আকবর আমার কাছে দেবতা।

জেলের ঠিকানায় আপনাকে চিঠি দিলাম না, কারণ তা হ'লে হয়ত আপনি এ চিঠির সবটুকু পেতেন না। আপনি আমাকে স্নেহ করেন, আপনাকে ভুলব না। প্রার্থনা করি, মিথ্যা অশান্তির চেয়ে আপনি পরিপূর্ণ জীবনের কামনা করবেন। বিদায়, হয়ত' এই শেষ; কারণ আমি এখন মুসলমানের অন্তঃপুরিকা। ইতি—

স্নেহাকাঙ্ক্ষিনী
সাকি।

এই লেখকেরই

পদ্মা

এক টাকা

খেয়ালী :—ক্ষেত্রবাবুর নূতন রচনা পদ্মা পড়ে আনন্দ পেয়েছি। বিভিন্ন রচনার মধ্যে একটি নিরবচ্ছিন্ন সুর আছে; সে সুর চির বিরহীর না-পাওয়ার মর্ম্মবেদনার সুর। এই যে না-পাওয়ার সুর, এই করুণ বেদনার বিলাপ,...একে অনায়াসেই শাশ্বত বলা যায়। তাই এই সুরটি, সকলের মনকেই সহজে স্পর্শ করে।...কতকগুলি সুন্দর পদ উদ্ধৃত করে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল,...। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর হয়েছে, মলাটের উপরের পরিকল্পনাটিও সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের পরিচয় দেয়—সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে এর যে দাম নির্দ্ধারিত হ'য়েছে তাকে সস্তাই বলতে হবে।......

দীপালী :—কবির লেখা নানা ছন্দে নামে বহু সাময়িক পত্রাদিতে সাদরে স্থান পাইয়াছে। তাহারই ভিতর হইতে... সুনির্ব্বাচিত কবিতায় গ্রন্থখানি গ্রথিত। প্রত্যেকটি কবিতাই

চিরন্তন মর্ম্মকথায় লীলায়িত।...আনন্দ পাইলাম। যাঁহারা কবিতা ভালবাসেন তাঁরা পদ্মা পাঠে নিশ্চিত তৃপ্তিলাভ করিবেন। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই, প্রচ্ছদপট—সুন্দর এবং সুরুচিসঙ্গত।

অর্চ্চনা :—...কবিতা-ক্ষেত্র নীরস 'কাব্যি' উৎপাদন করে নাই—ভাবে ভাষায় ছন্দে কবিতাগুলি সমৃদ্ধ।...

শান্তি :—সাময়িক পত্রিকার মারফতে ক্ষেত্রবাবু আজ বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। সাময়িক কাগজের পৃষ্ঠায় তাঁহার কবিতাগুলি পাঠ করিয়া, ক্ষেত্রবাবুর কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে বিশেষ আশান্বিত হইয়াছিলাম। আজ তাঁহার কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে দেখিয়া সে আশা সফল হইয়াছে। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে প্রত্যেকটি কবিতা সুনির্ব্বাচিত ও যথেষ্ট কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক।...বিশ্বের সেই আদি সঙ্গীতই কবির বীণায় নূতন করিয়া বাজিয়া উঠিয়াছে...বাংলার কাব্যসাহিত্যে অতুলনীয়।...

বসুমতী :—...শব্দ মাধুর্য্য, ছন্দের লালিত্য আছে...সত্যই সুন্দর।...

বঙ্গবাণী:—...পদ্মার কবিতাগুলি আমাদের ভালো লাগিয়াছে...কয়েকটি স্নেহসজল সুন্দর সকরুণ সুরে বইখানি উপভোগ্য হইয়াছে।

নায়ক :—...পদ্মার বৈশিষ্ট্য ইহার কবিতাগুলির সুরে বৈচিত্র্য আছে,...ছাপা ও কাগজ এবং বাঁধাই ভাল।

দুন্দুভি :—...কবিমনের পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।...প্রকাশের ভঙ্গিটিও অত্যন্ত সহজ...যথেষ্ট সংযমের পরিচয় ও প্রশংসনীয়।...

নবশক্তি :—...ছন্দে ও ভাবে উপভোগ্য।

প্রবর্ত্তক :—...হৃদয়গ্রাহী ভাব অনবদ্য ছন্দে ফুটিয়াছে।